পুনরুত্থান / অমর মিত্র

ও উড়িয়া যাওরে—ওরে বুলবুলি ময়না......, আসুন নপাহাড়ি নিয়ে যাই আপনাকে। ন’পাহাড়ির এক উপাখ্যান শোনাই। কাকে দিয়ে শুরু হবে সেই কাহিনি ? নীল রক্তের অনিন্দ্য তালুকদার, নাকি বাকি সকল ঝড়তি পড়তি প্রায় নীরক্ত মানুষগুলিকে নিয়ে? কোনো রক্ত ঘোলাটে, কোনো রক্ত কালচে, গুটলি পাকানো, সকলেরই হিমোগ্লোবিন কম, ফ্যাকাশে মুখ, দুর্বল লিভার, চোখের পাওয়ার খুব বেশি...... প্রোমোটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুবল রায়, ওসি, ইনসপেক্টার গোলকবিহারী কুন্ডু, সাব ইনসপেক্টার সুধন্য মাইতি, রাঙামাটি গ্রামের ভরত কুইলা, গোলকের স্ত্রী রণিতা, কন্যা টিয়া, ছিটমহলের কামিন লতা, নিমাই দাস আর সদয় মল্লিক...... আরো আছে কতজন, সন্ন্যাসী র্বমণ , অ্যাসিসট্যান্ট সাব ইনসপেক্টার ভগবান র্বমণ, কোচবিহার জেলার দিনহাটায় তার ঘর, তার সঙ্গে খুব ভাব ছিল ওসি গোলকবিহারীর। এ,এস,আই, ভগবান র্বমণ সন্ধের পর গুনগুন করত,

ও উড়িয়া যাও রে—ওরে বুলবুলি ময়না...।
একেলা ঘরে বসিরে—ও ওরে বুলবুলি ময়না।

ভাওয়াইয়া কয় ইয়ারে স্যার, মোর ঘরৎ নিয়া যামু আপনেরে।

একটি জীবন বহু জীবনে জড়িয়ে যায়। জীবন এক নাট্য। তার আরম্ভ এক, বয়ে যায় আর এক দিকে। জীবন কোনদিকে বয়ে যায়, কখন সে বাঁক নেয়, সেই বাঁক কখন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, কখন তা আরো সুস্থিতির দিকে যায়, কোনোটাই আন্দাজ করা যায় না। আমার জন্য কোন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে, আমি জানি না। এই উপাখ্যানের কেউ জানত না। এই উপাখ্যান কিছু নিরুপায় আর চাপাপড়া মানুষ আর এক নীলরক্তের মানুষের। আসুন আরম্ভ করি কাহিনি। আপনারা আমার সঙ্গে চলুন ন’পাহাড়ি, পাহাড় টিলায় ঘেরা সে এক মনোরম পৃথিবী। জায়গাটি খুব ভাল লেগেছিল থানার ওসি, দারোগাবাবু গোলকবিহারীর। ভেবেওছিলেন কতরকম...।

এক

অনিন্দ্য তালুকদার থানার ওসির ঘরে বসে কেবল টিভিতে আমেরিকান মেয়েদের হ্যান্ডবল দেখছিলেন। বল কাড়াকাড়ি খেলা। মারামারির পর্যায়ে চলে যায় পর্যন্ত । এখন তো ওই পশ্চিমে সকাল হলো। এখানে রাত। গঞ্জ নপাহাড়িতে আরো রাত। সমস্তদিক থেমে গেছে এই ব্লক গঞ্জে। শীত আছে অল্প। পশ্চিমের দেশে এখনো শীত। দিন কুড়ি ওখানে আগে তুষার ঝড় হয়ে গেল। নিউ ইর্য়ক তিন চার ফুট বরফের আস্তরণে চাপা পড়েছিল। এখন আবার জীবন স্বাভাবিক। বসন্ত আসছে। নেড়া গাছে পাতা, বরফ ভেদ করে তৃণের মুখ দেখা যাচ্ছে। তলস্তয়ের রেজারেকশন উপন্যাসে এমনি এক বসন্তের

বিবরণ ছিল। বসন্ত আসা ধরা যায় ঐ সব দেশেই, রাশিয়ায়, জার্মানিতে, ইউ এস এ-তে। সমস্ত শীত বরফের আস্তরণে চাপা পড়ে থাকে মাটি। শীতের অবসান হয় তুষার গলতে শুরু করলে, তুষার ভেদ করে তৃণের মুখ দেখা গেলে বসন্তের আগমন হয়। বসন্ত বোঝা যায় ঐসব দেশে। এদেশে তো ভাল করে শীতই পড়ে না, বিশেষত এই পশ্চিমবঙ্গে। অনিন্দ্যর আচমকা এইসব মনে পড়ল। ন'পাহাড়ি আসতে পলাশের বনে আগুন দেখেছেন ডি,এস,পি সায়েব। দিগন্তে যেন রক্তের ছিটে। গাড়ি থামাতে বলেছিলেন ড্রাইভার পল্টনকে। দেখছিস, কী দারুন লাগছে, মনে হয়েছিল আগুন লেগেছে।

ইয়েস স্যার, খুন-খারাবি।

রক্তের ছিটে লেগেছে যেন।

ইয়েস স্যার।

আর তখনই হাজত ঘর থেকে আর্তনাদ ভেসে এল। পল্টন কাজ শুরু করেছে। লোকটার নাম ভরত কুইলা। ওকে সাইজ করতে অনিন্দ্যর আসা এই গঞ্জে, ন'পাহাড়ি থানায়। তিনি একটু কাত হয়ে হাজত ঘরের দিকে তাকালেন। সেই পুরোন ফিলামেন্টওয়ালা চল্লিশ ওয়াটের ময়লা বাল্ব। ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। অনিন্দ্য তালুকদার টেলিভিশনের চ্যানেল সার্ফ করলেন রিমোটে। ফ্যাশন টিভি, জিরো ফিগারের মেয়েদের ক্যাটওয়াক। আবার চ্যানেল সার্ফিং, কুস্তি হচ্ছে। এক পালোয়ান আর এক পালোয়ানকে তুলে আছাড় মারছে। সমস্তটাই বানানো। হাজতঘরেরটাও যেন বানানো। অনিন্দ্যর মনে হয়েছে, তাই পল্টন বানাচ্ছে। টিভির শো হতে পারে। কুস্তি, বক্সিং...উঁহু, একটা চ্যানেল আছে, এ এক্স এন—অ্যাকশন, সেখানে এই রকম দেখায়, মেরেই যাচ্ছে মেরেই যাচ্ছে। অনিন্দ্য কিং সাইজ সিগারেট ধরালেন। ধরিয়ে সুখ টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ভাবলেন, বসন্তে চারদিকে ফুলে ফুলে খুন-খারাবি রং......এদেশে বসন্ত কবে আসে কবে যায়, ধরাই যায় না। পলাশবন এই জেলায় আছে, কলকাতায় তো নেই। ধুস! তখন আবার চিৎকার, বাবা গো।

কোন বাপ এসে তোকে বাঁচায় দেখি। পল্টনের কণ্ঠস্বর, না এ,এস,আই, সুধন্য মাইতির? অনিন্দ্য টিভি বন্ধ করে মোবাইল অন করলেন। নেট, ফেসবুক সদ্য এসেছে জগতে, অরকুট হারিয়ে যাচ্ছে। হোয়াট'স আপ অজানা। ফেসবুকে মেসেজ এসে বসে আছে, হাই অনিন্দ্য।

মধ্যবয়সিনী, অস্তগামিনী। অনিন্দ্য অফলাইন হলেন।

অনিন্দ্য তালুকদারের নীল রক্ত। কাকা ভারতীয় সিভিল সারভিসের। অনিন্দ্যর পিসি মধ্যপ্রদেশ ক্যাডারের আই,এ,এস। অনিন্দ্যর বাবা অজয় তালুকদার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিভিল সার্ভিসে চাকরি করে, প্রোমোশনে আই,এ,এস, হয়েছিলেন। অবসরের পর এক বহুজাতিক কোম্পানির পরার্মশদাতা ছিলেন। সরকারের সঙ্গে বহুজাতিক কোম্পানির দ্বন্দ্বে

তিনি বহুজাতিক সংস্থাকে এমন সমস্ত নথিপত্র দিয়েছেন, যাতে সরকারই বিপদে পড়েছে। কথাটা শোনা যেত। কিন্তু প্রমাণ করা সহজসাধ্য ছিল না। আর সরকারি মহলে অনিন্দ্যর বাবা তালুকদার সায়েবের অনেক প্রভাব ছিল। সরকার কখনো কখনো এক অনাথ শিশু, তার পক্ষে কেউ থাকে না। সে হারলে বা জিতলে আমলা কেরানিকুলের কিছু হয় না। আসলে সরকার কেউ না, কারোর নিজের না। অনিন্দ্য এই সামান্য ক'বছরের চাকরিতে বুঝেছে সরকার আসলে আম জনতার। পাবলিকের। যারা ভোট দিয়ে খুদ-কুড়ো, দু'টাকা কেজি চাল পায় তাদের। তাই সরকারি নথি বিপক্ষের হাতে গেলেও অলীক সরকারের কিছুই হয় না। আম জনতা অল্পতেই খুশি। বেশিটা চলে গেলে কী যায় আসে। বহু আমলা কেরানি, ভাল মন্দের সমাহার হলো সরকার। তাঁদের কারো দায় আছে, কারোর দায় নেই। যাঁর দায় আছে তিনি কাজ করতে গিয়ে কখনো উপরওয়ালা, কখনো অধঃস্থন র্কমচারীদের শ্লেষের পাত্র হন, নিগৃহিতও হন। তারপর থেমে যান। সরকার হলো ক্ষমতার আধার। সরকারের র্কমচারী সেই ক্ষমতার বিন্দু বিন্দু থেকে উপসাগর পর্যন্ত ধারন করেন। কিন্তু সাগরে পৌছনো হয় না। চরম ক্ষমতা কোথায় তা খুঁজে পাওয়া কঠিন। চরম ক্ষমতা থেকে ক্ষমতার নানা মাত্রা নানাজনের কাছে পৌছয়। ক্ষমতার বিন্যাসের সঙ্গে র্কমচারীর অবস্থান র্নিভর করে। আসুন সেই ঘটনায় আপনাদের নিয়ে যাই যা এখন ঘটছে সেই গঞ্জ ন'পাহাড়িতে। ন'পাহাড়ি থানায়।

ঘটনার দিন ছিল কোনো এক মার্চের দুপুর। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই জেলায় মার্চের' মাঝামাঝি এই সময়ে দিনমানে তাপ বেড়ে গ্রীষ্মের ভাব এসে যায়, বেলা পড়তে শুরু করলে পাথুরে মাটি ঠান্ডা হতে আরম্ভ করে। শীতশীতে ভাব ফিরে আসে। ফলে শীত গিয়েও যায় না। রাতের ঠান্ডা যেতে চৈত্র পার করতে হবে। সবে তো চৈত্র পড়ল। ন'পাহাড়িতে দিন দুই আগে কাল বৈশাখী, তারপর প্রবল শিলা বৃষ্টি হয়েছিল। ফলে আবার কদিনের জন্য শীত ভালো করে এসে গেছে। অনিন্দ্য তালুকদার সদর থেকে ন'পাহাড়ি পৌঁছেছিলেন বিকেল বিকেল। অনিন্দ্য জেলার ডেপুটি সুপার অফ পোলিস। পুলিসের সর্বময় র্কতা, সুপারের নিচে। কিন্তু তাঁর আশীর্বাদ ধন্য। পছন্দের যুবক। ভারতীয় পুলিস সারভিস। আই,পি,এস। তাঁকে জেলা শাসক থেকে জেলার পদস্থ র্কমচারীরা পছন্দ করেন। পছন্দ না করার কিছু নেই। ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম দশজনের ভিতর, র্অথনীতির ছাত্র, সেখানেও স্নাতকোত্তর অবধি অতি উজ্জ্বল তাঁর মুখ। বিদেশে পড়াবার আমন্ত্রণ এসেছিল পি,এইচ, ডির পর। কিন্তু তিনি যাননি। পরিবারে, আই,এ,এস, রেভিনিউ সারভিস, ফরেন সার্ভিস আছে। অনিন্দ্য তাই ভারতীয় পুলিস সার্ভিসে যোগদান করেন। অধ্যাপনায় তাঁর প্রবল অনীহা। অধ্যাপকের জীবনে বৈচিত্র কই ? অ্যাডভেঞ্চার কই? থ্রিলিং লাইফ তাঁর পছন্দ। শিক্ষক হলে সমস্ত জীবন ছাত্র পড়িয়ে সেমিনার করে যেতে হবে। অনিন্দ্য তাঁদের পরিবারের পথেই এসেছেন। কাকা অলীক,

বাবা অজয়, পিসি অজন্তা গুপ্ত, জেঠার ছেলে অসীম আছে ফরেন সার্ভিসে, সুইডেনে ভারতীয় এমব্যাসিতে। এহেন যাঁর পারিবারিক পরিচয়, তিনি তো সকলের পছন্দের মানুষ হবেনই। অনিন্দ্যর ভিতরে নীল রক্ত। তাঁরা অবিভক্ত বঙ্গের উত্তরাঞ্চলে রংপুর জেলার কোথাও তাঁরা তালুকদার ছিলেন। একটা তালুক মানে অনেক গ্রামের অধিকারী। আসল পদবী কুলীন ব্রাহ্মণ, মুখুজ্জে, মুখারজী। তাঁদের পরিবারের একজন, খুব সম্ভবত অনিন্দ্যর প্রপিতামহ রায়বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে। অনিন্দ্য ঠিক জানেন তার প্রপিতামহ কিংবা তাঁর বাবা জমি বাজি ধরে পাশা খেলতেন। আর তাতে অনেক জমি হাতিয়েছিলেন যেমন, হারিয়েছিলেনও। সে এক আশ্চয কাহিনি। পরে হবে।

জমি নিয়ে জুয়া খেলা, গ্রেট! বোঝা যায় নীল রক্ত কেন। অনিন্দ্য জেলার সদর আলো করে আছেন। সন্ধ্যার পর জেলা শাসকের ঘরে জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা আসেন। আড্ডা হয়। অনিন্দ্যও আসেন। ডি,এস,পি,র জায়গা আলাদা। ছফুট লম্বা গৌর বর্ণের অনিন্দ্য সকলের থেকেই আলাদা। জেলা শাসক প্রোমোটি আই,এ,এস। তিনি অনিন্দ্যকে স্নেহ করেন। মর্যাদা দেন। অনিন্দ্য আচমকা ভিজিটে এসেছেন ন'পাহাড়ি থানায়। ন'পাহাড়ি একটি ব্লক ও থানা। এখানে ছোট ছোট ন'টি টিলা পাহাড় আছে। পশ্চিম সীমান্তে দামোদর, বিহারীনাথ পাহাড়। শাল, পিয়াল, হরিতকীর বন আছে। সেই বনে ময়ুর আছে। গুলবাঘা জাতীয় প্রাণী আছে । ইদানীং বেশ কয়েক বছর এই বনাঞ্চল দলমার হাতিদের নিম্ন ভূমিতে নেমে যাওয়ার করিডোর হয়েছে। হাতির দল এই রুক্ষ জঙ্গল-পাহাড়ি এলাকায় থিতু হয় না। এখানে ফসল তেমন হয় না। তাদের খাদ্য আরো নিচের বনভূমিতে। এখানে দামোদরের তীরে গ্রামে গ্রামে মাটির নিচে কয়লা। সেই কয়লার বেআইনি খাদান কম নয়। কুয়ো খুঁড়তে খুঁড়তে একটু নিচেই কয়লার স্তর পাওয়া যায়, পুকুর কাটতে কাটতেও তা পাওয়া যায়। জমির মালিকানা ব্যক্তির হলেও, সাব-সয়েল রাইট, জমির নিচের খনিজের অধিকার রাষ্ট্রের। তা রাষ্ট্রেরই সম্পত্তি। কয়লাতে অধিকার রাষ্ট্রের। কয়লার চোরাচালান এই এলাকার আয়ের বড় উৎস। ওপেন কাস্টিং, কুয়ো খুঁড়ে কয়লা তুলে সমস্ত রাত ধরে গরুরগাড়ি, মিনি ট্রাকে হাইওয়েতে নিয়ে গিয়ে বড় ট্রাক বোঝাই হয়ে দূর ভারতবর্ষে চলে যায়।

অনিন্দ্য তালুকদারের সিভিল ড্রেস। প্যান্ট, শার্ট আর স্ট্রাপ শু। গাড়িটি বেশ বড়। লালবাতি জ্বলছিল সদর থেকে একঘন্টার রাস্তা এই ব্লকে আসা অবধি। ওসি লোকটার নাম গোলকবিহারী কুন্ডু। জিকে। মাঝারি উচ্চতার ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার অফিসার। শান্ত প্রকৃতির। বয়স বছর চল্লিশ। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার এক গ্রামে, যেখান থেকে ইছামতী নদী কাছে, বাংলাদেশ সীমান্ত কাছে। ওসি লোকটিকে অনিন্দ্য পছন্দ অপছন্দ কিছুই করেন না। কেন করেন না, তা তিনি জানেন না। সামান্য বছরদুই চাকরিতে তাঁর পছন্দ অপছন্দ খুব তীব্র। কাউকে ফেভার করেন, কাউকে না। ওসি তাঁর কাছে প্রায় অচেনা

মানুষেরই মতো। ওসিকে তিনি জিকে বলেন কখনো, কখনো স্রেফ কুন্ডু, তুমি। অধঃস্থন অফিসারকে তুমি বলাই যেন ব্রাহ্মণ্য রীতি। আমলা এবং আরক্ষা সার্ভিসে তিনি ব্রাহ্মণ। আসলে কুন্ডু লোকটাকে র্ধতব্যের মধ্যেই আনা যায় না। আর্কষণ নেই জিকের। ওসি নাকি খুব কড়া। হা হা করে হেসেছিলেন অনিন্দ্য এই ন'পাহাড়ির বেআইনি খাদানের মালিক অবিনাশ সরকারের কথা শুনে, বলেছিলেন,ওসির কতটা ক্ষমতা যে খুব কড়া হবে, আপনার অসুবিধে হচ্ছে না তো?

অবিনাশ এই অঞ্চলের প্রভাবশালী ব্যক্তি। রাজনীতি করেন না, কিন্তু রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব আছে। ক্ষমতাশীন দলের কাছে কীভাবে থাকতে হয় তা অবিনাশ জানেন। জেলা শাসক থেকে জেলার পদস্থ্ অফিসার, পুলিশের র্কতারা সকলেই তাকে চেনেন। অবিনাশ বলেছিলেন, স্যার, ভরত কুইলা, রাঙামাটির ভরত কুইলার কথা ওসিকে একটু জিজ্ঞেস করবেন তো।

কেন, কী হয়েছে ?

খাদান নিয়ে লিফলেট ছেড়েছে, ধসে নাকি তিনটে মরে গিয়েছিল, সেই পুরোন কেস, কিন্তু সেই ঘটনা তো মিটে গেছে স্যার, মিথ্যে অ্যালিগেশন ছিল।

একবছর আগে ঘটনাটি ঘটেছিল শুখাজোড় গ্রামে। ওপেন কাস্টিঙের সময় কুয়োয় ধস নামে। দুটি লোক চাপা পড়ে যায় ভিতরে। সেই মৃত্যু নিয়ে লোকদুটির স্ত্রীকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছিল খুব সম্ভবত ভরত কুইলা। সে একটি ফ্রি ইস্কুল চালায়, চেষ্টা করছে সরকারের অ্যাফিলিয়েশন পাওয়ার। হচ্ছে না। এইচ,এস-এর পর আর পড়েনি। ঘটনাকে চাপা দিতে হয়েছিল। অবিনাশ খরচ করেছিলেন অনেক। আসলে এমন ঘটনা তো হয়ে থাকে। এই সব নিয়ে নাড়াচাড়া করলে, ধরা পড়লে খাদান ব্যবসাই উঠে যাবে। মিডিয়া এসেছিল খোঁজ পায়নি। মৃত্যুর প্রমাণ ছিল না। কোথায় কোন খাদানে মরেছে, কারা খাদান করছে কেউ জানে না। মৃত্যু সংবাদ দিলেই হলো ? প্রমাণ ব্যতীত তা ছাপা যায় ? কাজের খোঁজে কতলোক ভিনরাজ্যে পাড়ি দেয় এখান থেকে। তেমন যে যায়নি, তা কে বলতে পারে? অভিযোগ করলেই হলো।

দুই

গোলকবিহারী কুন্ডু এই থানায় এসেছেন ছমাস। ইন্সপেক্টর হয়ে এতদূর। সহর্কমী যাঁরা তাঁর সঙ্গে চাকরিতে ঢুকেছিল, অনেকেই আগে প্রমোশন পেয়েছেন। গোলকের প্রমোশন আটকে গিয়েছিল ঠিক মতো উপরওয়ালার নির্দেশ পালন করতে না পারায়। অ্যানুয়াল কনফিডেনশিয়াল রির্পোট অ্যাভারেজ। অনেকগুলি বিষয় থাকে যে কোন চাকুরিয়ার দক্ষতা পরিমাপ করতে। সেগুলিতে এক্সসেলেন্ট, গুড, ভেরি গুড...ইত্যাদি মন্তব্য যদি না আসে উপরওয়ালার কাছ থেকে, পদোন্নতি আটকে যায়। অনেকদিন ধরে অ্যাভারেজ পাওয়া গোলক শেষ তিনবছর ভালো এস,পি-র অধীনে চাকরি করে সুখ্যাতি কুড়িয়ে উচ্চপদে

উঠে বদলি হয়ে এই দূর মফস্বলে। সেই এস,পি, মিঃ ব্রজেশ শর্মা এখন দিল্লিতে চলে গেছেন। মানুষটি গোলকের চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু তাকে যেন আগলে রেখেছিলেন বড় ভাইয়ের মতো। গোলক তাঁর চাকরি জীবনে এমন উপরওয়ালা পাননি আগে।

গোলক বসেছিলেন থানার বাইরের ঘরে। এটি থানার অফিস। অভিযোগ শোনা হয়, এফ,আই,আর, ডায়েরি সব এখানে নেওয়া হয়। ভগবান বর্মণ নেয়। ভগবান প্রমোশনে এ,এস,আই। ঢুকেছিল কনস্টবল হয়ে। তারও চাকরির রের্কড খুব ভাল না। তাই এই বয়সে প্রমোশনে উত্তরবঙ্গ থেকে পশ্চিম সীমান্ত বাংলায়। তার বাড়ি কোচবিহার, দিনহাটা। আর দুবছর আছে চাকরির। রিটায়ার করে গেলে পাওনাগন্ডা নিয়ে দিনহাটা চলে যাবে। গোলক এখনো বছর পনের চাকরি করবেন। গোলক চুপ করে ভগবানের পাশে বসেছিলেন। ভগবান বর্মণ বলল, স্যার আপনি বারণ করুন, পল্টন মন্ডলকে থামান।

এখন সব চুপচাপ। থানা এলাকাটি গঞ্জের প্রান্তসীমায়। বাজার অনেকটা দূরে। বাজারের গুঞ্জন এখানে শোনা যায় না। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকালেন গোলক। থানার সামনে অনেকটা খোলা জায়গা। বাঁদিক ঘেষে একটি ভীমাকার পাথরের স্তূপ। তার সামনে একটি মহুল গাছ। মহুলফুল হয়েছে অনেক। সকালে গাছতলায় বিছিয়ে থাকে মহুলফুল। বাতাসে এখনো তার নেশাধরানো গন্ধ। সেই গন্ধের ভিতরে মহুল গাছের নিচে কয়েকটি লোক। জনা পাঁচ। রাঙামাটি থেকে এসেছে। ভরত কুইলাকে নিয়ে যাবে। পল্টন এখন নিজেই থেমেছে। গোলক কী মনে করে বাইরে অন্ধকারে এলেন। সিগারেট ধরালেন। ডি,এস,পি, পাশের ঘরে। সিগারেট ধরাতে সাহস হচ্ছিল না। অথচ ডি,এস,পি, তালুকদার সায়েব তার চেয়ে বছর পনেরর ছোট। আকাশে তাকালেন গোলক। কত তারা ! ঝলমল করছে উপরটা। আজ কুয়াশা নেই। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি হবে। চাঁদ উঠতে দেরি আছে। জায়গাটা অনেক দূর কলকাতা থেকে, কিন্তু তাঁর মনে ধরেছে। পাহাড় টিলা অরণ্য, আদিবাসী, বাউরি বাগদি জনগোষ্ঠী...। তিনি যখন এসেছিলেন গত আগস্টের প্রথমে, পরপরই শ্রাবণ সংক্রান্তি, এক মাস বাদে ভাদ্র সংক্রান্তি। ভাদুগান আর ভাদুপুজোর সমারোহ দেখেছিলেন সংক্রান্তির আগের দিন। ভগবান বর্মণ তাঁকে ভাদু শোনাতে নিয়ে গিয়েছিল রাঙামাটি। তখনই ভরত কুইলার সঙ্গে আলাপ। সেই সময় ঘটনা ঘটে গেছে, চার মাস। ওসি বদলি হয়ে গিয়েছে। পরে একদিন থানায় এসে ভরত তাঁকে বলেছিল, ঘটনা সত্যি, খাদানটা খুঁজে বের করছে সে। খাদান মানে কুয়ো। কুয়ো কেটে কয়লা তোলা হয়। অবিনাশ সরকার সেই কুয়োটা বুঁজিয়ে দিয়েছে তো। কিন্তু খুঁজে বের করবেই। কতজন কবরে গিয়েছিল তা কি কেউ বলতে পারে ? সংখ্যাটা বেশি হবে। মনে হয়েছিল লোকটা একরোখা। দুর্বিনীত। ভরত কুইলা বছর পঁইয়ত্রিশ। পেটান শরীর। একটা ননঅ্যাফিলিয়েটেড স্কুল চালায়, আর বিঘে কয়েক জমি চাষ করে। তার জমির নিচে কয়লা থাকুক না থাকুক, ভরতের ভিতরে আগুন আছে। ভরতই বলেছিল, দাম-উদর

থেকে দামোদর স্যার। দামোদরের দুপাশেই মাটির নিচে দাম। গাছ। গাছই তো কয়লার জন্ম দিয়েছে। কয়লা হলো দাহ্য। আগুন। এই জায়গার মাটির নিচে আগুন। গোলকবিহারী অনুভব করেছিলেন, ভরতের ভিতরে আগুন। ভরতই যেন রাঙামাটি। শুখাজোড়ের কবর সে চিহ্নিত করবেই।

বুড়ো মতো একজন আসছে। ভরতের বাবা। লোকটা একটু ঝুঁকে হেঁটে এল। এসে গোলকের সমুখে দাঁড়াল। মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়েই থাকল। গোলক বললেন, ইন্টারোগেশন শেষ হলে ছেড়ে দেবে, কিছু কথা জানা দরকার মনে হয়েছে সায়েবের।

লোকটা তবুও দাঁড়িয়ে। গোলক অস্বস্তি বোধ করলেন। সিগারেট ফেলে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিতে দিতে শুনতে পেলেন আর্তনাদ। আবার সাইজ করা আরম্ভ হয়েছে। পল্টন সিগারেট খাচ্ছিল হয় তো হাজতঘরে বসে। সামনে উলটে পড়ে ছিল ভরত কুইলা। জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাকা দিল নাকি। তাইই হবে ? গোলকের বুক কাঁপল। লোকটা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ভরতের বাবা । থানাবাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ডাকল ভগবান বর্মণ, স্যার, শুনছেন।

ভগবান তাঁকে বাঁচিয়ে দিল, দ্রুত পায়ে তিনি থানার ভিতরে ঢুকলেন, কী হয়েছে ?

বড় সায়েব খোঁজ করছিল।

মাইতি কোথায় ?

সায়েবের ঘরে। ভগবান বলল।

তখনই আবার তীব্র গোঙানির শব্দ শোনা গেল। ভগবান বলল, স্যার থামান, পল্টনের নেশা হয় মানুষ পিটালে, মরে যাবে যে।

গোলক এগিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন। স্যার হ্যান্ডবল দেখছেন আবার, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সাব ইনস্পেক্টার মাইতি। সে জিজ্ঞেস করল, ডাকছিলেন স্যার।

অনিন্দ্য তালুকদার বললেন, হ্যাঁ, এই লোকটা থানায় আসে ?

গোলক বললেন, কয়েকবার এসেছে।

কেন ?

শুখাজোড় বলে একটি গ্রামে...।

লোকটা একটা চিঠি পাঠিয়েছে সেই হারিয়ে যাওয়া লোক তিনটির মায়ের বয়ানে, একেবারে হোম সেক্রেটারির কাছে, ইউ নো ইট, তোমাকে এনক্যোয়ারি করে রির্পোট দিতে বলা হয়েছিল ?

এনক্যোয়ারি করছি স্যার।

কবে দেবে ?

খুব তাড়াতাড়ি। কোনোক্রমে বললেন গোলক। অনিন্দ্য তাকে অনায়াসে তুমি করে বলে যাচ্ছে। তাঁর চেয়ে বছর পনেরর ছোট তো হবেনই। পদে অনেক উচুতে। ওই উচুতে গোলক কোনোদিন পৌঁছতে পারবেন না এই জীবনে।

এনক্যোয়ারি এই ভাবে করতে হয়, ইউ ক্যান গো নাউ। স্যার অনিন্দ্য তালুকদার তাকে হাত নাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে বললেন। গোলকবিহারী তখন বললেন, স্যার পল্টনকে এবার থামতে বলুন।

আরম্ভই তো করেনি, থামবে কী করে ?

লোকটার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

অনিন্দ্য বললেন, হাত পা ভেঙে ছেড়ে দেবে।

স্যার, ছেলেটা খারাপ না ? বলতে বলতে আবার চাপা গোঙানি শুনতে পেলেন গোলক। তিনি হাজত ঘরের দিকে তাকালেন। বুট পরা মস্ত একটি পা চেপে আছে ভরত কুইলার বুক। তাঁর ভয় করল, আবার বললেন, স্যার থামতে বলুন। কোনো জবাব পেলেন না। এতসময় সাউন্ড মিউট করা ছিল টিভির, সাউন্ড অন করে দিলেন চৌধুরী। চ্যানেল র্সাফ করে ওর্য়াল্ডি কাপ ফুটবল। গমগম করতে লাগল থানা বাড়ি। উল্লাস, র্গজন... চাপা পড়ে গেল গোঙানি...।

# #

সেইদিন পড়তি বেলায় আচমকা ডি,এস,পি,র গাড়ি এসে থেমেছিল থানার সমুখে। গাড়িটি স্পিডেই রাস্তা থেকে ইউ র্টান নিয়ে থানা বাউন্ডারিতে ঢুকে ব্রেক কষেছিল সশব্দে। লালবাতি তখনো র্ঘূণায়মান। আমি একটু চমকে গিয়েছিলাম, র্বমণ এসে বলেছিল, স্যার ডি,এস,পি, সায়েব। উঠে গিয়েছিলাম। আমি গোলকবিহারী কুন্ডু। ন'পাহাড়ি থানার ওসি। অবাক হলাম ডিএস পি সায়েবের সাডেন ভিজিটে। তিনদিন আগেই আমি তলব পেয়ে গিয়েছিলাম সদরে। একাই। তিনটি দরখাস্ত এসেছিল জেলা শাসকের কাছে। সেই দরখাস্ত তাঁর কাছ থেকে এস,পি-র কাছে। তা থেকে ডি,এস,পি। গ্রাম ঃ রাঙামাটি, থানা ঃ ন'পাহাড়ি, থেকে তিন মহিলার টিপছাপ দেওয়া তিনটি দরখাস্ত গিয়েছিল স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে। শুখাজোড় গ্রামে কয়লার বেআইনি খাদানের ধ্বসে মৃত তিনজনের মৃত্যু-তদন্তের আর্জি। তিনটি আর্জিই একই প্রকারের, একটি এখানে দেওয়া হলো।

মহামহিম স্বরাষ্ট্র সচিব,

মহোদয়ের প্রতি নিবেদন,

মহাশয়,

আমি ...জেলার ন'পাহাড়ি থানার অর্ন্তগত রাঙামাটি গ্রামের সুফলারানি বাউরি। আমার পুত্র ফকির বাউরি র্পাশ্বর্বতী শুখাজোড় গ্রামের অবিনাশ সরকারের কয়লা খাদানে গত ১৯শে ফেব্রুয়ারি কাজে যায়। আর ফেরে নাই। শুনিয়াছি ওই খাদানে ধ্বস

নামিয়াছিল। খাদান মালিক অবিনাশ সরকার সেই কথা স্বীকার করেন নাই। আর খাদান তো সরকারের অনুমোদিত নহে। এই অঞ্চলে মাটির নিচে কয়লা সুলভ হওয়ার কারণে প্রচুর খাদান হইয়াছে। যেভাবে কুয়ো খুঁড়িয়া কয়লা উত্তোলন করা হয়, তাহাতে ভয়ানক ঝুঁকি। সেই কুয়োয় র্দুঘটনা ঘটিলে তাহা ভরাট করিয়া দেওয়া হয়। কবর হইয়া যায় খনি শ্রমিকের, চাপাপড়া মানুষের।

কয়লা বেআইনি ভাবে পাচার হইয়া যাইতেছে প্রতিদিন। থানা ইহা জানিয়াও অজ্ঞাত কারণে বন্ধ করিবার উদ্যোগ নেয় না। সেই ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হইয়া অজ্ঞাত কারণে থামিয়া যায়। থানার তৎকালীন অফিসার ইনচারজ শিশুতোষ মন্ডল বদলি হয়ে যান। আমার বিনীত নিবেদন এই যে আমার পুত্র ফকির বাউরির মৃত্যু তদন্ত সর্ম্পূণ করিয়া দোষী খাদান মালিককে শাস্তি দেওয়া হউক। এই অঞ্চলে এইরূপ ধ্বস প্রায়শ ঘটিয়া থাকে। খাদানের ভিতরে থাকা মজুর চাপা পড়ে, তাহাদের জীবন্ত কবর হইয়া যায়, কিন্তু ঘটনা প্রকাশ্যে আসে না। খাদান মালিক দামোদরের ওপার থেকে মজুর লইয়া আসায়, ঝাড়খন্ডের ভবঘুরে মজুর লইয়া আসায় ধ্বস ও মৃত্যুর কথা চাপা পড়িয়া যায় মাটির নিচে। আপনি সদাশয়, আশা করি এই ঘটনার প্রকৃত তদন্ত করিয়া আমার পুত্র শোক নিবারণ করিবেন.........

চমৎকার বয়ান। কম্পিউটারে টাইপ করা পিটিশনে টিপ ছাপ। আমাকে ডি,এস,পি, বলেছেন রির্পোট দিতে। গত পরশু এস,আই, সুধন্য মাইতি সদরে গিয়েছিল। যাওয়ার আগে বলেছিল, ডি,এস,পি, সায়েব তলব করেছেন। সে গিয়েছিল। কেন ডেকেছিলেন সাহেব তা জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেছে, পুলিশের অ্যানুয়াল স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন নিয়ে কথা বলতে ডেকেছিলেন, জেলার পুলিস ফ্যামিলিতে কাদের বউ কিংবা মেয়ে গান গাইতে পারে, আবৃত্তি করতে পারে, অভিনয় করতে পারে তার তালিকা করতে বলেছেন মাইতিকে।

আমি অবাক হয়েছিলাম। মাইতি তো গান, অভিনয়, সাহিত্য, কবিতার একশো মাইলের ভিতরে নেই। স্পোর্টস নিয়েও যে আগ্রহী তা আমি শুনিনি কোনোদিন। তাকে কেন এই তালিকা র্নিমাণের ভার দেবেন অনিন্দ্য তালুকদার সাহেব। তিনি উচ্চ শিক্ষিত। প্রচুর বই পড়েছেন। মিটিঙে একদিন চার্লস ডিকেন্সের অলিভার টুইস্ট উপন্যাসের কথা বলছিলেন। লন্ডনের সমাজ বিরোধী, ভিখিরিদের নিয়ে উপন্যাস। আমি ছোটবেলায় অলিভার টুইস্ট অনুবাদে পড়েছিলাম। মনে আছে। গ্রামের লাইব্রেরিয়ান কাম পোস্টম্যান সুবোধদা আমাকে দিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম , ডিকেন্সের অলিভার টুইস্ট পড়েছি স্যার। তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। অধঃস্থন কেন পড়বে ? অনিন্দ্য তালুকদার মাইতিকে ডেকেছেন সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা করে ? বিশ্বাস হয়নি। মাইতি চোখে মুখে মিথ্যে বলে। কোনো কারণ ছাড়াই মিথ্যে বলে। কখনো মনে হয় এইটা তার অসুখ, সত্য মিথ্যায় তার

নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কখনো মনে হয় উল্টোটা। সবটাই মাইতি পরিকল্পনা করে বলে। সত্যকে আড়াল করতে ওর তুলনা নেই। যে কোনো তদন্ত রিপোর্ট এমন ভাবে গুলিয়ে দেয় যে আদালতে তা দিয়ে কোনো কাজ হয় না। আদালত পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়। মাইতি আদালতের তিরস্কার শুনেছে অনেকবার। তাতে ডিপার্টমেন্টে তার সুনামই হয়েছে। অন্যায় কাজের শাস্তি, আদালত অবমাননা থেকে উপরওয়ালারা বেঁচেছেন। আমার মনে হয়েছিল স্যার ওই পিটিশনের ব্যাপারেই ডেকেছিলেন মাইতিকে। সে চেপে গেল।

তিন

থানায় ঢুকেই তালুকদার সাহেব ওসির চেয়ারে গিয়ে বসেছিলেন। ওসি তাঁর উলটো দিকে। সাব ইনস্পেক্টর সুধন্য মাইতি ওসি গোলকবিহারী কুন্ডুর পাশে। এ,এস,আই, দুজন, ভগবান র্বমণ ও নীহার বেরা বাইরে। কনস্টবল পাঁচজনও বাইরে। তাদের সন্ত্রস্ত হয়ে থাকারই কথা। তালুকদার সাহেবের মুখোমুখি হয় না তারা ভয়ে। এদের ভিতরে একজন গুণধর মিদ্দে তো এসেছে সদর থেকে বদলি হয়ে। সে সাহেবকে যমের মতো ডরায়। তার ডিউটি ছিল সাহেবের বাংলোয়। বাংলোয় ডিউটিতে থাকা এস,আই, তাকে নির্দেশ দিয়েছিল, সায়েব মেমসাহেবের জামাকাপড় কাচতে। সে না করায় এখানে বদলি। সাহেব তা জানে কি না তা তার অজ্ঞাত, মনে হয় জানে। নিশ্চয় জানে। আবার মনে হয় জানে না সায়েব। অত শিক্ষিত ছেলে, বলতে পারে এই কথা ? তাঁর বউয়ের অন্তর্বাস পর্যন্ত বাথরুমে ডাঁই হয়ে পড়েছিল। শায়া, ব্লাউজ, শাড়ি, ব্রা, প্যান্টি। যে কাচত সেই কাজের মেয়েটি অসুস্থ হয়ে আসছিল না, তাই ওই নির্দেশ। কনস্টবল ওই কাজ করবে? ম্যাডাম নাকি আদেশ দিয়েছিল বছর পঁয়তাল্লিশের গুণধর কনস্টবলকে দিয়ে কাচিয়ে নিতে। গুণধর কথাটা র্বমণকে বলেছিল। র্বমণ বলেছে ওসিকে। গুণধর যমের মতো ভয় করে সাহেবকে। সাহেবের কাজ না করে চলে এসেছে তো ঠিক। সায়েব তার চাকরি খেয়ে নিতে পারে। চুরির দায়ে হাজতে ভরে দিতে পারে, ক্ষমতা এতই। সেই কথা বলেছিল সাব ইনসপেক্টার। এমন কথা লিখে যাবে সার্ভিস বুকে, পেনশনই হবে না।

ভগবান র্বমণও বলে, তার ভয় করে। তালুকদার বংশ তো। পরে নাকি, মানে স্বাধীনতার আগে জমিদারিও কিনে নিয়েছিল নীলামে। আসলে জমিদারবংশ। তারা ছিল প্রজা। যদিও তারা ছিল কোচবিহারের রাজার প্রজা, কিন্তু তালুকদারের জমিও তো কোচবিহারের ভিতরে ছিল। আর রংপুরে ছিল তালুকদার সায়েবদের নীলামে ধরা জমিদারি। তখন রংপুর শহর দিনহাটা থেকে দূরে ছিল না খুব। এখন অবশ্য ভিনদেশে, অনেক দূরে। র্বমণ বলেছিল, দিনহাটা রংপুর সড়ক আছে এখনো। ধরলা নদীর ধারে কাশেমের ঘাটে গিয়ে শেষ হয়েছে। আগে রেলপথে যাওয়া যেত। গীতালদহর কাছে সেই রেল ব্রিজ ১৯৮৪-র বন্যায় ভেঙে গেছে। সারাই করা আর হয়নি। গাড়ি তো চলে না। ওপারে মোগলহাট, বাংলাদেশ, রংপুর সেখান থেকে খুব দূরে নয়, বাসে ঘন্টাদেড়

বড়জোর। একবার গিয়েছিল র্বমণ একটা বিয়েতে। র্বডারে তখন কাঁটাতার ছিল না। যাওয়া আসা চলত। র্বমণের কাছে রংপুর যাওয়ার পথ জেনে নিয়েছিল ওসি গোলকবিহারী কুন্ডু। রংপুরে ছিল তালুকদার সাহেবদের আদি নিবাস। তাঁরা তাঁদের জমি নিয়ে জুয়া খেলতেন তাও বলেছে র্বমণ। সেই রাজার আমলে জমিদারির আমলে তালুকদারির আমলে ওইটাই ছিল দস্তুর। ফলে রংপুরের জমিদারির ভিতরে কোচবিহারের রাজার জমি ঢুকে গিয়েছিল, মানে দিনহাটায় ওঁদের জমিদারির জমি আর গ্রাম আছে। আর র্বমণের ঠাকুরদা সেই জমি কিনে ফেঁসে গিয়েছিলেন নাকি। র্বমণ বলেছিল, সেই জমি মানে গ্রামটি এখন ভারতের ভিতর বাংলাদেশ, সেখানে ভারতের কোনো অধিকার নেই যেমন, বাংলাদেশও ফিরে তাকায় না। স্যার হয়তো জানেন, হয়তো জানেন না। সেই গ্রাম হরিশের তালুকে ইন্ডিয়া বলো বাংলাদেশ বলো, কোনো প্রশাসনই নেই। ছিটমহল বলে। হরিশ তালুকদার অনিন্দ্য তালুকদারে প্র-প্রপিতামহ কিংবা তাঁর পিতামহ। জুয়ো খেলতেন তিনি। র্বমণ এত জানে।

ডি এস পি বসেই মাইতিকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুলে আনতে পারবে ?

মাইতি সব জানত। সায়েব আসবে তাও। মাইতি বলেছিল, ইয়েস স্যার।

সুধন্য মাইতি তো স্যারের প্রীতিভাজন। গোলকবিহারী জানেন তাঁর চেয়ে স্যার তার অধঃস্থনকে বেশি পছন্দ করেন, গুরুত্ব দেন। মান্থলি মিটিঙ বা ক্রাইম মিটিঙে সুধন্যকে নিয়ে যেতে হয়। কাগজপত্র সব সুধন্যর হাতে থাকে।

# #

আমি বসে থাকি, আমার থানার সাব ইনসপেক্টারই সব রির্পোট দেয়। স্যার আমাকে একটু ছোটই করে দেন। কিন্তু এও জানি আমার রির্পোট স্যারকে খুশি করতে পারে না। একই রির্পোট সুধন্য দিলে স্যার কোনো কথা বলেন না। কিন্তু রির্পোটে কোনো অসঙ্গতি থাকলে আমাকেই জবাবদিহি করতে হয়। কোনো রির্পোটে সন্তুষ্ট না হলে, আমাকেই ব্যখ্যা করতে বলেন স্যার। আমার এক এক সময় মনে হয়, মিটিঙে সুধন্যই যাক, আমি থাকি থানায়, কিন্তু তা তো হবে না। জবাব যে সুধন্য দেবে না।

স্যার এসেই বলেছিলেন, মাইতি লোকটাকে তুলে আনো তো, ইন্টারোগেট করব, পিটিশনটা সেই লিখেছে তো।

ইয়েস স্যার, টাইপ করেছে মা তারা সাইবার কাফেতে, ওদের কম্পিউটারে ফাইলটা সেভ করা আছে এখনো।

লোকটা কি নক্সাল ?

হতে পারে স্যার।

মাওবাদি ?

হতে পারে স্যার।

আমি অবাক, মাইতি আমাকে না জানিয়ে স্যারের কথায় পিটিশন নিয়ে তদন্ত করেছে। কিন্তু তদন্তের আর্জি তো তিনটি যুবকের অর্ন্তধান নিয়ে। তাদের মায়ের আর্জি তাই। বেআইনি কয়লা খাদান নিয়ে অভিযোগ। তালুকদার সায়েব সেই তদন্ত আমাকে করতে বলে, পিটিশন কোথায় কে লিখিয়েছে তা মাইতিকে দিয়ে তদন্ত করিয়েছেন। তদন্ত করে বের করেছেন অভিযোগটা লিখিয়েছে কে ? গাঁয়ের গরিব চাষী পরিবারের মা কি জানে কার কাছে কী লিখে সুবিচার চাইতে হবে? কম্পিউটারে টাইপ করেই নিজেকে ধরিয়ে দিয়েছে ভরত কুইলা। তালুকদার সাহেব বললেন, আমি ওকে মিট করতে চাই, কী জানে ও, অভিযোগটা কেন লিখিয়েছে ?

আমি বললাম, ইললিগাল কয়লা খাদান এদিকে তো আছে স্যার, একেবারে মিথ্যে না, এখানে বিশ-তিরিশ ফুট নিচেই কয়লা।

তুমি সেই মাইনিং দেখেছ ?

রেইড করে ধরেছিলাম, কিন্তু ছেড়ে দিতে হলো।

কেন ছেড়ে দিয়েছ ?

আমি চুপ। ছেড়ে দিয়েছিলাম স্যারের প্রাইভেট সেক্রেটারির ফোনে, শম্ভু চট্টরাজ আমাকে বলেছিল, চাপ আছে ওসি সাহেব, অনেক ব্যাপার, স্যার চান না।

স্যার ছেড়ে দিতে বলেছেন ?

শম্ভু চট্টরাজ বলেছিল, আপনি বুঝতে পারছেন না, গাড়লের মতো কথা বলছেন।

শম্ভুর কথা অমনি। সেই আদেশের কথা আমি বলতে পারলাম না। অনিন্দ্য তালুকদার আচমকা হেসে বললেন, মাটি খুঁড়ে দেখতে হবে নাকি কয়লা আছে কি না, আর যদি থাকেও, জমি যার সে তুলছে, অসুবিধে কী ?

মাইনিং রুলস অ্যান্ড অ্যাক্টে সাব সয়েল রাইট স্টেটের।

স্টেট কী, স্টেট তো পাবলিক নিয়ে, এইসব আইনের জন্য আমাদের ডেভলপমেন্ট এত শ্লো, লোকটাকে নিয়ে এস তো মাইতি, কুন্ডু তুমিও যাও।

আমার মন কু ডাকল। কেন তা আমি বলতে পারব না। ক'দিন আগেও ভরত কুইলা থানায় এসেছিল। হ্যাঁ, দরখাস্ত সে-ই লিখিয়েছে। স্বরাষ্ট্র সচিবের সেক্রেটারির চিঠি তাদের গ্রামে পৌঁছেছে। সেই চিঠিতে স্বরাষ্ট্র সচিব লিখেছেন, তাদের অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত জেলাশাসকের নিকট পাঠানো হয়েছে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। ভরত কুইলা জানে দরখাস্ত ধাপে ধাপে নিচে নামে। মানে তাদের থানাতেই আসবে। এসেছে কি না সে খোঁজ নিতে এসেছিল। আমি শেষ পর্যন্ত চুপ করে ছিলাম। শেষে মাথা নাড়িয়ে বলেছিলাম, না, আসেনি।

মাইতিকে নিয়ে আমি বেরিয়েছিলাম। মনে মনে আমি একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। মাইতি এই তদন্তটা করেছে আমাকে না জানিয়ে। থানার ওসি তো আমি। থানার ভালো মন্দ

আমার হাতে। আমি মাইতির অ্যানুয়াল কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টের সূচনা করব। তাতেই তার পদোন্নতি হবে। ফাইনাল রিপোর্ট অবশ্যই ডি, এস, পি হয়ে এস,পির কাছে যাবে। মাইতি আমার অধঃস্তন, কিন্তু আমাকে না জানিয়ে এই থানার দখল নিচ্ছে। থানায় একটি সমান্তরাল ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করছে। ডি,এস,পি আমাকে পছন্দ করেন না, তার মানে মাইতি আমার কাজ করবে। আমি পারি না, মাইতি পারে। হ্যাঁ, পারে। মাসে একটা টাকা তুলে সে সদরে দিয়ে আসে। এইটা দস্তুর। আমি পারি না। পারি না বলেই আমার প্রমোশন দেরিতে হয়েছে। ব্রজেশ শর্মা না থাকলে আমি প্রমোশনই পেতাম না। তিনিও আমার চেয়ে ছোট। পাঞ্জাবের মানুষ। হি লাইকড মি। ভালবাসতেন। তাঁর কথা ভাবলে আমার চোখে জল এসে যায়। আমি একবার বড় রাজনৈতিক চাঁইয়ের স্নেহভাজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। রেপ কেস। আমাকে নিষেধ করা হয়েছিল স্থানীয় এম,এল,এ-র কাছ থেকে। রিপোর্টটা গুলিয়ে দিতে বলা হয়েছিল। আমি পারিনি করতে। সব প্রমাণই ছিল অকাট্য। এম,এল,এ শাসিয়ে ছিল চাকরি খেয়ে নেবে বলে। পরিকল্পনা করে ঘুষের দায়ে ফেলবে তা শুনেছিলাম এক কনস্টবলের কাছ থেকে। ব্রজেশ শর্মা আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বলতেন, মিঃ কুন্ডু, আঙ্কেল, র্নিভয়ে কাজ করুন, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কমন পিপল, ট্রুথ......, চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির। রবীন্দ্রনাথ টেগোর বলে গেছেন। ভয় শূন্য হলেই শির উচ্চ থাকে। প্রায় নিঃঝুম বেলায় মাইতিকে নিয়ে রাঙামাটি গ্রামের পথে যেতে যেতে ব্রজেশ শর্মার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার। অনেকদিন বাদে মনে পড়ল। দিল্লিতে আছেন। নম্বরটা আমি হারিয়ে ফেলেছি মোবাইল হারিয়ে। আলো পড়ে এসেছে, আমি ড্রাইভারের পাশে, পেছনে মাইতি এবং তার বশংবদ এক কনস্টবল। তার নাম তারকনাথ। কথা বলে কম। যেটুকু বলে মাইতির সঙ্গে, গুজগুজ ফুসফুস। মাইতি তার মাসের কালেকশন তারকনাথকে দিয়েই করায়। তারকনাথ আবার কিছু স্থানীয় যুবককে দিয়ে বাজারের টাকা তোলায়। রেশন ডিলার থেকে দোকান, ব্যবসা, রাস্তায় সওদা নিয়ে বসা গ্রামের মানুষ থেকে কয়লার খাদান, চিনা মাটির খাদান, পাহাড়ের ধারে গজিয়ে ওঠা হোটেল, রির্সট, পাহাড়ভেঙে শহরে পাথর চালান দেওয়া ক্রাশার, সব। ...সবই টাকার উৎস। পঞ্চায়েত থেকে থানা। ন'পাহাড়ি একটি টাকার খনি। এখানে আমাকে কেন পাঠিয়েছে উপরমহল, আমি জানি না। অনেক অভিযোগ পেয়েছি এর ভিতরে, কিন্তু থামাতে পারিনি। জুলাইয়ে যখন এসেছিলাম, আমের সিজিন শেষ। বেনারসি ল্যাংড়া মালদহের ফজলি বাজারে এসেছে। তারকনাথ খুব ঝামেলা করত। থলে হাতে বাজারে গিয়ে আম তুলছিল একদিন, অভিযোগ নিয়ে ছুটে এসেছিল বিক্রেতা আর ক'জনকে নিয়ে। আমি খুব ধমক দিয়ে সেই আম ফেরত দিইয়েছিলাম। তাতে মাইতি আমাকে পরে বলেছিল, পাবলিকের সামনে এসব করবেন না স্যার, এতে ওদের ভয় চলে যায়, পাবলিককে একটু ভয়ের ভিতরে রাখতে

হয়। পুলিশ তো এসব করবে। আম তো তারকনাথ একার জন্য আনেনি, থানা একটা পরিবার , সকলের জন্যই ও এনেছিল, থানা কিনে খাবে কেন ?

আমি কঠিন গলায় বলেছিলাম, আমি আপনার কথা মানতে পারছি না, আমি তো বেতন পাই কাজের জন্য, লুট করে খেতে হবে কেন?

মাইতি বলেছিল, স্যার খুব ভাল করে ভাবুন, পাওয়ার না দেখালে কেউই কন্ট্রোলে থাকবে না, আপনি এভাবে তারকনাথকে বাধ্য না করলেই পারতেন।

আগের থানাতেও এমনি ছিল। কিন্তু আমি থানার দায়িত্বে ছিলাম না। আমার মতো আরো দুজন ছিল, নিরীহ প্রকৃতির বলেই তারা পরিচিত ছিল আমার সঙ্গে। আমাদের গাড়ি ধীরে ধীরে চলছিল, আমি মাইতিকে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার আসবেন, আপনি জানতেন ?

মাইতি জবাব দিল না।

চার

ব্রজেশ শর্মা বলেছিলেন, আঙ্কেল, এহি দস্তুর, আপনার কিছু করার নেই, আপনি চেষ্টা করবেন নিজে অনেস্ট থাকতে, রুপিয়া নিবেন না, লেকিন ইফ ইউ ট্রাই টু স্টপ ইট, ইউ উইল বি হ্যারাসড, ইউ উইল ফেস অকোয়ারড সিচুয়েশন, ফ্যামিলি পিস নষ্ট হবে, আপনার সে পাওয়ার নেই যে বন্ধ করবেন, তবে কিনা বস অনেস্ট থাকলে সাবরডিনেটেরা সাহস পায় না, আপনি অনেস্ট থাকলে অফিস কিছুটা অনেস্ট থাকবে, ওইটাই লাভ।

তাহলে আমি কী করব, পুলিস সার্ভিস ছেড়ে দেব ? গোলকবিহারী জিজ্ঞেস করেছিলেন।

নো, এই সারভিসেও পিপলকে সারভ করা যায়, সব সময় হেল্পলেস পিপলের পাশে থাকবেন, চেষ্টা করবেন, ইউ উইল গেট আল্টিমেট প্লেজার ফ্রম দ্যাট অ্যাকটিভিটি।

গোলকের যে কেন মনে পড়ছিল ব্রজেশ শর্মার কথা। বেলা ফুরিয়ে চারদিক থেকে অন্ধকার এগিয়ে আসছিল পায়ে পায়ে। ড্রাইভার কানু মন্ডল এত ধীরে চালাচ্ছে যে রাঙামাটি পৌঁছতে রাত নেমে যাবে। দিনের আলো থাকতে থাকতে পৌছলে সুবিধে হয় যে কোনো কাজে। তদন্তে, গ্রেপ্তারে। অন্ধকারে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির গা ঢাকা দিতে সুবিধে হয়। মাইতি বলে উঠল, আরে স্পিড বাড়াও।

কানু জবাব দিল না। গাড়ি তেমনি চলছিল। গোলকের মনে হলো কানু ইচ্ছে করে ধীরে চলছে। ন’পাহাড়ি থেকে রাঙামাটির পথে চড়াই উৎরাই, পথের ধারের ছোট ছোট টিলা, পাহাড়। তার কোনো কোনোটায় ক্রাশার বসেছে। বাতাসে সিলিকার শাদা ধুলো। এই তো পুজোর পরপর এসেছিল একটি বিজ্ঞানকর্মী সংগঠন। সিলিকার পরিমান বাতাসে বেশি। মেপে নিয়ে তারা বলেছিল, ক্রাশারে কাজ করা শ্রমিকদের স্বার্থ দ্যাখে না লিজ হোল্ডার। শ্রমিকরা সবাই সিলিকোসিসে ভুগছে। তারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিল সব

শ্রমিকের, ফুসফুসে ঢুকছে সিলিকা। থানা ব্যবস্থা নিক। কিন্তু লিজ তো দিয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি, থানা করবে কী? লিজ হোল্ডার মান্যবর যাদব তার লোক দিয়ে বিজ্ঞানকর্মীদের পিটিয়েছিল। ভয় দেখিয়েছিল প্রাণে মেরে দেবে। তখন সদ্য এসেছিলেন তিনি থানার দায়িত্বে। সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন গোলক। অভিযোগ নিয়ে মাইতিকে তদন্ত করতে পাঠিয়েছিলেন। মাইতি রিপোর্ট দিয়েছিল, সব মিথ্যে, বাইরের লোক এসে উস্কানি দিয়ে ক্রাশার বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল।......একেবারে মন গড়া রিপোর্ট। তারপর চাপ। পঞ্চায়েত এবং সদর অফিস, এস,পি এবং ডি,এস,পি। ক্রাশার একটা ইন্ডাস্ট্রি। বন্ধ করে দিলে কত লোকের কাজ যাবে। তিনি রিপোর্ট দিয়েছিলেন, ক্রাশার মেসিন পরিবেশকে দূষিত করে দিয়েছে, শ্রমিকদের জন্য মাস্ক ব্যবহার করা উচিত, নিঃশব্দে মানুষ খুন হয়ে যাচ্ছে। সেই রিপোর্ট নিয়ে উচ্চবাচ্য হয়নি। ডি,এস,পি সাহেব একটি মিটিঙে বলেছিলেন, ওসি ন'পাহাড়ি, পুলিশ সমাজ সংস্কারের কাজ করে না, এইসব বিজ্ঞানমঞ্চ সমস্ত কাজেই অবস্ট্রাকশন করে, ঝামেলাবাজ, ইউ শুড নো ইট।

মাইতিকে বললেন গোলকবিহারী , ওকে নোটিস দিয়ে ডাকতে পারতেন সাহেব নিজের অফিসে।

মাইতি তাঁর কথা প্রসঙ্গে না গিয়ে বলল, অন্ধকার হয়ে গেল, গা ঢাকা দিতে পারে, স্পিড নে কানু।

কানু বলল, রাস্তা খারাপ, টায়ার পাংচার হয়ে গেলে পড়ে থাকতে হবে, এক্সট্রা নেই।

পথের একপাশে জঙ্গল, অন্যপাশে ন্যাড়া পাহাড়। ন্যাড়া পাহাড়ের পাশ দিয়ে গাড়ি ঘুরে পশ্চিম দিকে ঢুকল। আকাশের রক্তিমাভা মুছে গিয়ে তারা জ্বলে উঠেছে। শুখাজোড় গ্রামটি রাঙামাটি ছাড়িয়ে। সুখাজোড়ে তদন্তে যেতে গিয়ে রাঙামাটি গ্রাম পার হয়েছিলেন গোলক। শুখাজোড়ে বিস্তীর্ণ অহল্যাভূমি দেখেছিলেন। মাইতি সঙ্গে ছিল। কোথাও কোথাও লালমাটির স্তুপ, মাটি ভরাট করা খাদ চোখে পড়েছিল। মাইতি বলেছিল, অভিযোগ মিথ্যে স্যার। অনেক এনক্যোয়ারি হয়েছিল, কিছুই বের হয়নি।

গোলক কিন্তু আন্দাজ করেছিলেন, বুঝতে পারছিলেন নিস্তব্ধ অহল্যাভূমিতে কিছু একটা হয়েছে। সুবোধ ঘোষের ফসিল গল্পের কথা মনে পড়েছিল তাঁর। হাজার হাজার বছর পরে মাটির নিচ থেকে যে ফসিল উঠে আসবে খননে, তা থেকে পুরাতন প্রস্তর যুগের কথা মনে পড়বে মানুষের। কোনো এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হয়তো পাতাল গহ্বরে প্রবেশ করেছিল প্রকৃতির কাছে নিরূপায় মানুষ। ভরাট করা গহ্বর দেখে তো ধরা যায় কিছুটা। তিনি সেদিন মাইতির কথায় সাড়া দেননি। নতুন এসেছেন তো। বুঝে নিতে হবে। গণকবর। থানায় এসে তাঁকে বলেছিল ভরত কুইলা, ইয়েস স্যার, শুখাজোড় গ্রামটা কবর, অনেক চাপা পড়েছে ধ্বসে। সেই জুলাইয়ের কথা। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তদন্ত করতে বলেছিল যুবকটি। কারা মরেছে কেউ জানে না স্যার, দামোদরের ওপার থেকে মজুর নিয়ে আসা

হয়, নামহীন গোত্রহীন মানুষ। পরিচয় নেই। গ্রামের তিনজন গেছে বলে বুঝতে পারলাম। উৎসাহে তদন্তে এসেছিলেন তিনি মাইতিকে নিয়ে। আবার মাইতির সঙ্গে যাচ্ছেন রাঙামাটি গ্রামে। ইলেকট্রিক এসেছে গ্রামটিতে, কিন্তু ভোল্টেজ খুব লো। মিটমিটে আলো, তা অন্ধকারকে যেন আরো রহস্যে ছেয়ে দিয়েছে।

মাইতি বলল, পেলে হয়, স্যার বসে আছেন, আমি ফোন করছিলাম, নট রিচেবল।

গোলক বললেন, কিন্তু রাতে নিয়ে যাব কেন ?

স্যার ইন্টারোগেট করবেন, আপনার সঙ্গে তো ভাল রিলেশন স্যার, আপনাকে দেখলে ও আপত্তি করবে না।

গোলক ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, আমি কিছু বলব না, গাড়ি থেকেও নামব না।

তা কী করে হয়, আপনি ওসি, ন'পাহাড়ি।

ডি,এস,পি-র কথা বলুন।

মাইতি গাড়ি থেকে নেমেছিল কনস্টবল তারকনাথকে নিয়ে। তখন ড্রাইভার কানু বলেছিল, ইচ্ছে করে অন্ধকার করে দিয়েছি স্যার, আমি গাড়িটা খারাপ করে পথের ধারে রেখে দেব যাওয়ার পথে।

গোলক বলেছিলেন, ডি এস পি থানায় আছেন, তাঁর গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন, উপরন্তু উনি রেগে যাবেন, যদি নিজেই চলে এসে গাড়ি গাড়ি পরীক্ষা করেন।

পথের ধারেই বাড়ি। একটা ল্যাম্প পোস্ট ছিল। আলো নিচে অবধি নামছিল না যেন। এদিকটায় ঠান্ডা একটু কম। মাটির নিচের কয়লা, দাহ্য পর্দাথ হেতু বসন্তে বিলীয়মান শীতলতা কম। নামতে নামতে মাইতি নিজেকে খোলস থেকে বের করে এনে বলল, শুয়ারের বাচ্চাটাকে তুলে একটু সাইজ করে ছেড়ে দেবে ডিয়েসপি স্যার, পিটিশনটা ওইই লিখিয়েছে, যে কেস মিটে গেছে তা নিয়ে গোলমাল পাকাতে চাইছে, খাদান বন্ধ করবে বলছে ফলস অ্যালিগেশন দিয়ে।

বুঝতে পেরে গোলক জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনটে লোক খাদানে কাজ করতে গিয়ে তো ফেরেনি।

ধুর, দেখুন গিয়ে রানিগঞ্জ আসানসোল কিংবা দিল্লি মুম্বইয়ে গিয়ে কাজ করছে, এদিকের লোক কত যাচ্ছে ওদিকে, দিজ ভরত কুইলা খুব বেড়েছে, ইললিগাল মাইনিং বন্ধ করে দিতে চাইছে, কিন্তু তা হবে কেন, ওকে বলেছিলাম আমি থামতে, ও শোনেনি।

গোলক একটু আন্দাজ করতে পারলেন। খাদান বন্ধ হয়ে গেলে অনেক টাকা মাসোহারা বন্ধ হয়ে যাবে, তাই মাইতি কেন উপরমহল অবধি ক্ষেপেছে। বড় সায়েব অনিন্দ্য তালুকদারের একটু আসামী পেটানর অভ্যেস আছে তা কানাঘুষো শুনেছি। মাইতি সব কিছু ভাঙেনি আগে। সায়েব সাইজ করার জন্যই বসে আছেন থানায়।

মাইতি ঢুকে গেল ভিতরে। হাতে ছয় ব্যাটারির টর্চ। আলো ফেলতে লাগল লো ভোল্টেজের ভুতুড়ে আলোয় ডুবে থাকা বাড়ির গায়ে। মাইতি হাঁক মেরেছিল, থানায় যেতে হবে, ওসি নিজে এসেছে।

আবছা আলোয় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। গোলকের কাছে একটি বয়স্ক লোক এসে দাঁড়িয়েছিল গাড়ির জানালায়। সে ভরত কুইলার বাবা। ক্ষীণ স্বাস্থ্য, ন্যুব্জদেহী সেই লোকটি জিজ্ঞেস করেছিল, স্যার ও কী করেছে?

গোলক কিছুই বলতে পারেননি। সত্যিই তো, সে কী করেছে? কিন্তু তিনি তো তাকে তুলতে আসেননি, অথচ দায় তো তাঁর, তিনিই তুলছেন। জানেন না কেন তুলছেন। গোলক মাইতিকে বলেছিলেন, থাক, বলে দেবেন বাড়ি নেই।

মাইতি বলল, স্যার, ডিয়েসপি সাহেব ধরতে পারবেন মিথ্যে, সাঙ্ঘাতিক ঘ্রাণ শক্তি ওঁর, উনি বসে আছেন।

গোলক না পেরে বললেন, কেন তুলব তা জানি না কেন আমি, আগে বলেননি কেন ?

মাইতি বলল, শয়তানটার শিক্ষা দরকার, মাইনিং বন্ধ করে দেবে, কলকাতায় পিটিশন করেছে ও।

গোলকবিহারী চুপ করে গেলেন। যুবকটির পিঠে হাত দিয়ে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে মাইতি ওকে নিয়ে এল। কোনো অভিযোগ নেই, এফ, আই, আর, নেই, অথচ তাকে তোলা হলো। সে মাথা তুলেই এল, আমাকে জিজ্ঞেস করল, যা জিজ্ঞেস করার এখেনে কি হতো না স্যার, আমি তো সব বলেছি আপনাকে।

না, ডিয়েসপি সায়েব থানায় আছেন, যা বলার তা বলবি তাকে। মাইতি বলেছিল। মাইতির ওই কথাটা অন্ধকারে দাঁড়ান ছায়া ছায়া মানুষগুলো শুনেছিল। শুধু ওই কথাটা আমাকে বাঁচাতে পারে যে তা পরে বুঝেছিলাম।

সমস্ত পথ আমি আর একটি কথাও বললাম না। আশ্চয ! কানু যেন ঝড়ের গতিতে উড়িয়ে নিয়ে চলল জিপ। ভাঙাচোরা রাস্তা, গাড়ি টাল খাচ্ছিল। হেড লাইটে গভীর অন্ধকার, পথের ধারের বনভূমি, নেড়া পাহাড়, টিলা, তৃণহীন প্রান্তর তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। গাড়ি টাল খেতে খেতে ন'পাহাড়ির দিকে ছুটে চলছিল। গোলকবিহারী ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিলেন, পেছনে অন্ধকারের স্তূপ নিস্তব্ধ, চুপ করে বসে আছে ভরত কুইলা, পাশে তারকনাথ । মাইতি তাদের উল্টোদিকে একা। সিগারেট ধরিয়েছিল মাইতি। একবার বলে উঠল, আসতে চালা, অ্যাকসিডেন্ট করবি নাকি ?

এই কথায় কানু যেন গতি আরো বাড়িয়ে দিল। জিপটির হর্ন একটু বিগড়ানো। গোঙানির মতো আওয়াজ বের হচ্ছিল। চারদিকের অন্ধ নিস্তব্ধতা ভেঙেচুরে গোঙাতে গোঙাতে জিপ ছুটছিল। কানু যেন সবদিকে জানান দিতে দিতে ছুটছিল গাড়ি নিয়ে। পরে গোলকের মনে হয়েছিল ভরত কুইলাকে যে কোনো অভিযোগ ছাড়া, অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট

ছাড়া তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা জানাতেই যেন অহেতুক র্হন বাজাচ্ছিল কানু। আমাদের সমস্ত গোপনীয়তা সে ভেঙে দিতে চাইছিল। আর তাতেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল মাইতি। সে চাইছিল সমস্তটাই যেন চাপা থাকে। হ্যাঁ, তাই। গোলকের একবার মনে হলো কানু গাড়িটা উলটে দেবে। তার হাতে স্টিয়ারিং, সে জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেবে জিপ। শাল গাছে গিয়ে ধাক্কা মারবে। তখন আর ন'পাহাড়ি পৌঁছন হবে না। একবার মনে হলো বাঁদিকের টিলার গায়ে গিয়ে আছড়ে পড়বে জিপ। মাইতি চিৎকার করে উঠেছিল, আরে, আসতে চালা, পাগল হয়ে গেলি নাকি ?

কানু চাপা গলায় হিসহিস করে বলল, সায়েব বসে আছে যে আসামীর জন্য।

গাড়ি শেষ পর্যন্ত এসে পৌছেছিল ন'পাহাড়ি। ভরত কুইলাকে নিয়ে সায়েবের সামনে হাজির করল মাইতি, বলেছিল, পেয়েছি স্যার কালপ্রিটকে, এই নিন।

ভরত কুইলা বসে পড়েছিল সায়েবের সমুখের চেয়ারে, আর সঙ্গে অনিন্দ্য তালুকদার র্গজে উঠেছিলেন, শুয়োরের বাচ্চা উঠে দাঁড়া, যা জিজ্ঞেস করব জবাব দিবি।

গোলকবিহারী ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। থানাবাড়ির সামনের রাস্তায় তখন একটি অটো রিকশা থেমেছিল, তা থেকে নেমে এল পাঁচজন মানুষ। তাঁদের জিপের পিছু পিছু এসেছিল তারা। গোলক শুনতে পাচ্ছিলেন ডি,এস,পি-র র্গজন। গোলক কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

পাঁচ

পল্টন লোকটা আসলে কনস্টবল। ছফুট লম্বা। তেমনি স্বাস্থ্য। সেই ভরত কুইলাকে থানা হাজতে পুরে পল্টনকে সাইজ করতে বললেন তালুকদার সায়েব। তাঁর সঙ্গে আর কী কথা হয়েছিল ভরতের সঙ্গে তা আমি জানি না। তখন রাঙামাটির এক মধ্যবয়সী আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, ভরতের নামে অভিযোগটা কী ?

আমি বলেছিলাম, সায়েব কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেবে, তেমন কিছু নয়।

বললাম বটে তেমন কিছু নয়, কিন্তু সায়েবের র্গজন দুবার কানে এল। একবার র্আতনাদ। এরপর কী হয়েছিল, আমি থানা বিল্ডিঙে ঢুকে গিয়েছিলাম, একবার উঁকি দিয়ে দেখেছিলাম তিনি টেলিভিশনে একা হ্যান্ডবল খেলা দেখছিলেন। সর্মথ সর্মথ মানুষজন বল কাড়াকাড়ি করছে। মাইতি অন্য ঘরে। আমি বাইরের অফিস ঘরে বসে আছি। র্বমণ রয়েছে। তারকনাথ কনস্টবল নেই। কী হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না। বাইরের ঘর থেকে হাজত দেখা যায় না। দেখা যায় ওসির ঘর। ঘরের র্পদা টানা থাকলে ওসিকে দেখা যায় না। এখন র্পদা নেই। সিগারেট জ্বলছে। মাইতি ঢুকল। স্যারের সামনে মাইতি দাঁড়িয়ে। র্আতনাদ কানে আসছিল। র্গজন করছিল পল্টন। আমি ছুটে স্যারের কাছে গেলাম, বন্ধ করুন স্যার।

ইউ, কুণ্ডু, ইডিয়ট,, বাইরে গিয়ে বস।

স্যার, ওর নামে কোনো এফ,আই,আর, নেই। আমি স্পষ্ট করে বললাম, নো অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট, ঠিক হচ্ছে না স্যার, আন ল ফুল ইন্সিডেন্ট।

স্যার আমার দিকে রক্ত চক্ষু নিয়ে তাকালেন। মাইতি ঘাড় ঘুরিয়ে ইঙ্গিত করে আমাকে বেরিয়ে যেতে বলল। আমি হাজতের দিকে তাকালাম, লোকটা চিত হয়ে পড়ে আছে, তার বুকের উপর বুটপরা পা তুলে দিয়েছে পল্টন। শীর্ণকায় যুবক একদিকে মাথা কাত করে শ্বাস নিচ্ছে। পল্টনের হাতের রুল ঘুরছে। পল্টন রুল নামাচ্ছে। আমি চিৎকার করে বললাম, প্লিজ স্যার, পল্টনকে থামতে বলুন।

বলার সঙ্গে সঙ্গে পল্টন রুল নামিয়ে আনল। আমি আতঙ্কে চোখ বুঁজলাম। মরণ কান্না শুনছিলাম। আমি কাঁপতে কাঁপতে বাইরে চলে এলাম । কিন্তু সেই আর্তনাদ বাইরে বসেও শুনতে পাচ্ছিলাম। র্বমণ আমাকে বলল, ভয় করছে স্যার, লোকটা মরে যাবে।

আমি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিলাম। কানাঘুষো শুনেছি মানুষ পেটান দেখা স্যারের একটা নেশা। ওঁর পূর্বপুরুষ জমি বাজি ধরে জুয়ো খেলতেন। কিন্তু তা তো শোনা কথাই ছিল। আগের দিনে ওসব হতো। জমিদার, তালুকদারদের কত জমি, অনেক টাকা থাকলে জুয়ো খেলে লোকে। না থাকলেও বাজি লাগায়। জমি না থাকলে তো জমির জুয়ো হতো না। স্যারদের ছিল, খেলতেন। গ্রাম ধরে ধরে। আর জমিদার তালুকদারের তো কড়া মেজাজ হবেই। অবাধ্য প্রজা শাসন করা তাঁদের পরম্পরা। স্যারের ফ্যামিলিতে ব্লু ব্লাড। স্যারের শ্বশুর দিল্লিতে আছেন। ক্যাবিনেট সচিব। স্যারের স্ত্রী আই,আর,এস। ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস। উচ্চবংশ জাত। স্যার এইচ,এস-এ তৃতীয় হয়েছিলেন। মেধাবী। আমি ফার্স্ট ডিভিশন। স্টার হয়নি। অনেক পরীক্ষা দিয়ে এস,আই-এর চাকরি। প্রমোশনে ইনসপেক্টার। আর কি উঁচুতে ওঠা যাবে ? এ, এস, পি--- অ্যাসিসটেন্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিস। হবে না। আমার অ্যানুয়াল কনফিডেনসিয়াল রিপোর্টে আমাকে শেষ করে দিয়ে যাবেন এই সাহেব। আমার ব্যবহার ঠিক পুলিস র্কমচারীর মতো নয়।

আর্তনাদ ক্ষীণ হয়ে এল। থেমে গেল। বেরিয়ে এসেছে পল্টন। ঘামছে। সায়েবের ঘর থেকে ছুটে এল, মাইতি, আমাকে বলল, হাসপাতালে পাঠাতে হবে স্যার, একটু বেশি হয়ে গেছে।

সেই রাতের কথা মনে পড়ে। নিঃশব্দে সায়েব বেরিয়ে গেলেন। আমার দিকে তাকালেন না। তাঁর পিছু পিছু পল্টন। আমি দেখলাম বাইরে গাছ তলায় জনাপাঁচেক লোক। তারা আমাদের পিছু পিছু এসেছিল অটোয়। ভরতের বাবা দাঁড়িয়ে ছিল। আমি র্বমণকে বললাম, এখন কী হবে, স্যার চলে গেলেন।

ভগবান র্বমণ চাপা গলায় বলল, পল্টন এর আগে একবার মানুষ মেরেছিল স্যার, আমি জানি, জনকপুর থানায়। প্রমাণ হয়নি, সুইসাইড বলে চালিয়ে দিয়েছিল সদর অফিস।

আমি আর পারলাম না, মাইতিকে বললাম, তুমিই হসপিটালে নিয়ে যাও, তুমিই তুলেছ।

তখন কলকাতা থেকে আমার বউ রণিতা ফোন করল। আমি ফোন ধরে বললাম, পরে কথা বলছি, মিটিঙে আছি।

রণিতা বলল, টিয়ার জ্বর ছেড়েছে।

টিয়া আমাদের মেয়ে। আমাদের ফ্ল্যাট বাগুইয়াটিতে। রণিতা একটি বিধাননগরে সেচ ভবনে ক্লার্ক। টিয়া বড় স্কুলে পড়ে। আমি মাসে একবার বাড়ি যাই, কখনো দুবার হয়। হাইকোর্টে মামলা তো থাকেই। কেস ডায়েরি, রির্পোট, স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্টস নিয়ে সরকারি উকিলের সঙ্গে কথা বলতে হয়। কোর্টেও হাজিরা দিতে হয়। মেদিনীপুরের মাইতির বাড়ি এখন এই জেলাতেই। মাইতি কলকাতায় যেতে চায় না। রণিতার ফোনে মেয়ের জ্বর রেমিশন হওয়ার কথা শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে ফোন কাটতেই মাইতি অভিব্যক্তিহীন গলায় বলল, ওসির র্অডারে তোলা হয়েছিল স্যার, ওসি নিজে গিয়েছিলেন রাঙামাটিতে।

বলতে বলতে মাইতি কিং সাইজ ডানহিল সিগারেট ধরায়। মাইতি এই সিগারেটই খায়। আমি চুপ। আমার চোখের সামনে সেই অহল্যাভূমি ভেসে উঠল। সেই যে আগস্টের প্রথম। আকাশে মেঘ। ঘন্টাখানেক আগে এক পশলা হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টির জল ওই মাটিকে স্নিগ্ধ করতে পারে না। ভেজাতেই পারে না। জল পড়লেই তৃর্ষ্ণাত মাটি শুষে নেয়। মাটি নয়, মাটির নিচে চলে যাওয়া মানুষ। তাইই নিয়েছিল যেন তারা। আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। তখন ভগবান র্বমণ আর গুণধর কী কথা বলছিল একটু সরে। তারকনাথ এতক্ষণে এল বাইরে থেকে। নেশা করেছে, জড়ানো গলায় বলল, নুলো করে দিয়েছে নাকি, স্যার চলে গেলেন।

গুণধর বলল, স্যার হাসপাতালে নিয়ে গেলে বেঁচে যাবে।

আমার ভয় করল। গুণধরের কথা শুনে তারকনাথ বিড়বিড় করল, বেজম্মা, এবার থেকে ঘরে পড়ে থাকবে, পিটিশন ওর পিছনে ঢুকে যাবে, দেখে আসি।

মাইতি বসেছিল একটা চেয়ারে, বলল, স্যার দেরি করবেন না, ডিয়েসপি সাহেব বলে গেছেন হাসপাতালে দিতে, আমাদের কাস্টডিতে হয়েছে তো।

আমার মনে পড়ে আমরা একটি মুর্মূষু, চেতনাহীন দেহ নিয়ে গিয়েছিলাম ব্লক হাসপাতালে। জিপের পিছনে তাকে শুইয়ে রেখে দুই কনস্টবল, গুণধর ও তারকনাথ ছিল পেছনে। ভগবান র্বমণ ছিল ড্রাইভারের পাশে। আমি পিছনের গাড়িতে। মাইতি এল না, আমাকে বলল, বলবেন হাই রোডে পড়ে ছিল এইভাবে, মৃগি ছিল লোকটার, সদর থেকে ফিরছিলেন, দেখে তুলে এনেছেন, আপনার তো সুনাম আছে দরদী অফিসার বলে, বিশ্বাস করবে, আমি থানায় থাকলাম, ব্লক মেডিকাল অফিসারকে ফোন করছি, সে অ্যাকসিডেন্ট বলে রির্পোট করবে, চিন্তার কিছু নেই।

আমি কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। সমুখে বিস্তীর্ণ অহল্যাভূমি থর থর করে কাঁপছিল। চাপাপড়া মানুষ জীবন্মৃত হয়ে মৃত্তিকা গর্ভে শ্বাস নিচ্ছে। ভরত কুইলা বেঁচে আছে বলে মনে হয় না। আর যদি বেঁচে থাকেও এখনো, বেশি সময় টিকবে বলে মনে হয় না। বুকের খাঁচা আর মাথার খুলি ফাটিয়ে দিলে কেউ বাঁচে ? আমি তাকে দেখিনি। দেখতে পারিনি। কথাটা আমাকে বলেছে ভগবান। চুপ করে ছিলাম। আমার এখন করণীয় কী ? ব্লক মেডিকাল অফিসার কি বিশ্বাস করবে আমার বয়ান ? আমাদের অনুসরণ করছিল একটি অটো। সেই অটো, হয়তো তাকে রেখে দিয়েছিল ওরা ভরতকে নিয়ে ফিরবে বলে। ব্লক মেডিকাল অফিসার তাঁর কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে এসে গিয়েছিলেন। কম বয়সী ডাক্তার। ন'পাহাড়ি হাসপাতালে কিছুই নেই প্রায়। যে রোগী আসে, তার সিংহভাগ আন্ত্রিকের। স্যালাইন দিয়ে ফেলে রাখে হাসপাতাল, রোগীর পরমায়ু থাকলে বাঁচে। আর প্রসূতি আসে। সন্তান কোলে বেরিয়ে আসে। নতুন মায়েদের লড়াই করার শক্তি খুব, ডাক্তার আমাকে বলেছিল একদিন। সমুখে গ্রীষ্ম। গ্রীষ্মে আন্ত্রিকের প্রকোপ বাড়বে। তার আগে প্রচুর স্যালাইনের বোতল মজুত করতে হবে, ডাক্তার হাসতে হাসতে বলেছিল। স্ট্রেচারে করে ভরতকে নিস্তব্ধ হাসপাতালে নিয়ে যেতেই তাকে দেখে ডাক্তার এগিয়ে এসেছেন। আমি দূরে। তিনি এবং একজন নার্স নিচু হয়ে দেখলেন মিনিট পাঁচ। ডাক্তার আমার দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কী করে হলো মিঃ কুন্ডু ?

আমি জবাব দিতে পারলাম না।

দেখে বুঝতে পারেননি, হাজত থেকে বের করলেন কেন? বলে আমার দিকে যেভাবে তাকালেন, আমি দেখলাম, চোখে সন্দেহ আর বিস্ময়, মাল্টি নাম্বার ইনজুরিস, অনেক, কী করে হলো, স্বাভাবিক ইনজুরি নয়, আন্ত্রিকের পেশেন্ট নিয়ে এই লোকটি কতবার এসেছে, রাঙামাটির তো, ভরত, হ্যাঁ ভরত কুইলা, আমি ওকে চিনি, ভালো ছেলে।

আমি বললাম, কী বলব, বুঝতে পারিনি যে এতটা হয়ে গেছে, আমার কিছু করার নেই, বাট আই হ্যাভ নট ডান ইট।

এরপর দীর্ঘ এক অপেক্ষা আরম্ভ হলো। ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ফোন করলেন'মহকুমা মেডিক্যাল অফিসারকে। তিনি বললেন ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট হয়ে গেলে মর্গে পোস্ট মরটেমের জন্য পাঠাতে হবে। তার আগে নয়। আমি কিছুক্ষণ বসে থাকলাম ডাক্তারের ঘরে। বডি চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। চার ঘন্টার আগে ম্যাজিস্ট্রেট এনক্যোয়ারি করবেন না। ব্লক মেডিক্যাল অফিসারের কাছে আমরা আটটা নাগাদ পৌঁছেছি। এর ভিতরে মাইতির ফোন এসেছিল, আমি বললাম, তুমি এস মাইতি, আমি বুঝতে পারছি না, ব্লক মেডিক্যাল অফিসার বলছে বেঁচে নেই।

মাইতি ফোন কেটে দিল। ফোনটা সে করেছিল, সে-ই কেটে দিল। সে কী বলত আমি জানি না, কিন্তু কথা না বলে বন্ধ করে দিল। আমি ফোন করলাম, বেজে গেল ধরল

না। রাত বাড়ছে। বাতাসে হিমেল ভাব। এই অঞ্চলে যত রাত বাড়ে, পাথুরে মাটি ততো ঠান্ডা হয়, আমি চুপ করে বসে ছিলাম। একজন মধ্যবয়সিনী সিস্টার ঘুরছিলেন। আমাকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছেন, আবার ফিরে আসছেন। আমাকে ডাক্তার আবার বললেন, এক্সপায়ারড, ব্রট ডেড বলে রির্পোট করছি, আপনি একটা ডেড বডি নিয়ে এসেছেন, আপনি কি সাইন করবেন ? আমি স্ক্যান করে রির্পোট মেইল করব।

আমাকে করতে হবে সাইন ?

আপনি তো ডেড বডি এনেছেন। তরুণ চিকিৎসকের কণ্ঠস্বর আচমকা রুক্ষ হয়ে ওঠে, দেখুন মিঃ ওসি, আপনি এনেছেন বলে আমি রির্পোট করছি, সাইন করেন বা না করেন তা আপনার ইচ্ছে।

আমি বললাম, সাইন করে দিচ্ছি, কিন্তু আই হ্যাভ নট ডান ইট।

সে তো পুলিসই এনক্যোয়ারি করে বলবে, আপনি থানায় ফিরবেন না ম্যাজিস্ট্রেট এঙ্ক্যোয়ারির জন্য ওয়েট করবেন ?

আমি কোর্য়াটারে ফিরি, উনি এলে ফোন করবেন।

আমাকে বসে থাকতে হবে, আপনি কজন রাইফেলধারীকে পাঠিয়ে দিন, যদি পাবলিক সমস্যা করে।

পাঠিয়ে দিচ্ছি। বলে উঠে পড়লাম। সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। অন্ধকার নড়ে উঠল ওই দূরে। তারা ক'জন বসে আছে। থাকুক। আমি কিছু ভাবতে পারছিলাম না। বললাম একটু হাইওয়ের দিকে ঘুরিয়ে আনবে কানু?

কানু আমাকে বলল, স্যার, আফশোস হচ্ছে, আমি কেন জঙ্গলের ভিতরে গাড়ি ঢুকিয়ে দিলাম না।

আমি চুপ। কানু বলল, মেরে ফেলেছে, র্মাডার, আমার মনে হয়েছিল স্যার কিছু একটা হবে, ওর ফোন নম্বর ছিল না আপনার কাছে ?

আছে তো। বিড়বিড় করলাম আমি।

আপনি ফোন করে বলে দিতে পারতেন বাড়িতে না থাকতে।

আমি বললাম, আমি ভাবিনি এমন হবে।

পল্টনকে নিয়ে এসেছে মানে কিছু হবে, আপনি জানতেন না স্যার ?

আমি মাথা নাড়লাম। কানু বিড়বিড় করল, পল্টনকে নিয়ে আসা মানেই কিছু একটা হবে স্যার, আমি তাই জানতাম, এখন কী করবেন আপনি ?

ছয়

আসলে ছাপোষা কেরানি হলেই ভাল হতো গোলকবিহারীর, কিংবা ইস্কুল মাস্টার। সে নিজেই বোঝে পুলিস সার্ভিসে সে অযোগ্য। ট্রেনিঙে কত খিস্তি খেয়েছে। একবার প্যান্ট খুলে

দেখাতে হয়েছিল আসলে সে সত্যিকারের পুরুষ কি না। কিছুই না, কলিগদের একটু মজা করা। সে টের পায় তার ভিতরটা নরম। গোলক ছেলেবেলায় কারোর গায়ে হাত দেয়নি। মার খেয়ে ফিরেছে, কিন্তু মার দেওয়ার কথা ভাবেনি কখনও। হাতই উঠত না। তার সহপাঠীরা ইচ্ছে হলেই তাকে মারত। মেরে হে হে করে হাসত। গোলককে ধোলাই দেওয়া কত সোজা। কুকুরের লেজে ফুলঝুরি বেঁধে দেওয়ার মতোই মজার। সে একটু ভীতু প্রকৃতিরই। অন্ধকারে তার ভয় ছিল, নির্জনতায় তার ভয় ছিল, বোশেখ-জষ্টির লম্বা দুপুরে, খা খা দুপুরে তার ভয় ছিল। মনে হতো বিদেহী, অশুভ শক্তিরা সব তাকে ঘিরে ফেলছে। একবার সেই লম্বা দুপুরে ইস্কুলের তিন বন্ধু যাচ্ছিল ইছামতী দেখতে। গোলকের ইচ্ছেই ছিল বেশি। ইছামতীর ওপারে বাংলাদেশ। সেই দেশে ক'দিন আগে মিলিটারি শাসন চালু হয়েছে। গোলকের বাবা কাকাদের দেশ ইছামতীর ওপারে সাতক্ষীরার কাছে। ঠাকুমা শুধু ওপারের কথা বলত। গোলকের মনে হয়েছিল র্বডার দেখে আসে। তখন সে ক্লাস এইট। র্বডারের গল্প সে দুই বন্ধু নিমাই আর সদয়ের কাছে শুনত। তারা সাত জায়গা ঘুরে বেড়াত। কত জায়গার কথা বলত। মেয়েছেলের কথা বলত। গোলক তাদের কাছেই প্রথম নারী পুরুষের জীবন রহস্য শোনে। নিমাই তাকে একদিন বলেছিল, র্বডারে গেলে ওপারের মানুষ দেখা যায়। গোলক ওপারের মানুষ দেখতে হেঁটেছিল নিমাই আর সদয়ের সঙ্গে। পথ অনেকটা। প্রায় একঘন্টা লেগেছিল পায়ে হাঁটতে। তখন চৈত্র মাস। মাঠ জমিন শুকনো, দূরে শিমুল গাছ রক্তরাঙা ফুল ফুটিয়ে আকাশে মাথা তুলেছে। ইছামতী দেখা গেল। ওই জায়গায় তার বিস্তৃতি একটু কম, ওপার দেখা যায়। সে অবাক। ওই ওপার অন্য দেশ ! নদী বাঁধে সীমান্ত প্রহরীদের তাবু। ঘর। বাঁধে উঠেছে তো নিমাই আর সদয়, নিমু আর সদু তাকে ফেলে আচমকা অন্য দিকে ছুটল। কেন ছুটল তা সে বোঝেইনি। তারা বাঁধ থেকে নেমে অদৃশ্য হতেই গোলকের সামনে আর্বিভূত হলো খাকি পোশাক, গোল গোল চোখ, পাকানো মোচ, কাঁধে রাইফেল, মাথায় টুপি আর বুটপরা এক সীমান্ত রক্ষী।

কৌন, হিঁয়া কিঁউ ? তারপর হিন্দিতে কীসব জিজ্ঞেস করতে লাগল। গোলক কিছুই বুঝতে পারে না। হিন্দি শুনে তার ভয় করতে থাকে। মনে হতে থাকে কঠিন ভাষায় শাসাচ্ছে প্রহরী। এসে জেরা করতে লাগল রাইফেলধারী সীমান্ত রক্ষী। গোলক ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। কেউ কোথাও নেই। সামনে নদী। নদীর ওপারে অন্য দেশ। উফফ, লোকটা গোলককে বলল, নাঙ্গা হ।

কেন? কোমরে হাত চেপে রাখে গোলক।

পেন্ট উতার।

না কাকা। গোলক কাঁদতে কাঁদতে বলেছে।

এই খুল পেন্ট, উতার। বলে লোকটা তার প্যান্ট ধরে টান দিল। ঢলঢলে প্যান্ট বাঁধা ছিল মায়ের শাড়ির পাড়ে। পাড় ছিড়ে গিয়ে সড়সড় করে প্যান্ট নেমে এল পায়ের কাছে। গোলক উদোম হয়ে গেল। প্রহরী তার প্যান্ট কেড়ে নিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, যা ভাগ!

এই ছিল সেই লোকটার মজা। সে খুব রোগা ছিল, হাড়-পাঁজরা দেখা যেত সারা গায়ের। তাই তাকে খুব পছন্দ হয়নি মোচওয়ালা সেই বিহারী রাইফেলধারীর। না হলে তো তাকে তাঁবুর ভিতরে নিয়েই যেত। সে চুপ করে মাটিতে উবু হয়ে বসে থাকল। শার্ট টেনেও কিছু হচ্ছে না। তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে হু হু করে। ভয়ে সে কুঁকড়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছিল। আগেই সে শুনেছিল এই সব পুলিসরা তাদের ডেরায় নিয়ে গিয়ে দলাই মলাই করে। ১৪-১৫র ছেলে ওদের খুব পছন্দ। তাদের ইস্কুলের দুই বন্ধু সদু আর নিমু তাকে নিয়ে এসেছিল ওই কাজটি করাতে। সীমান্ত পুলিশের জন্য ইস্কুলের ছেলে ভেট আনে তারা। বিনিময়ে পয়সা পায়। যাদের ভেট দেয়, তারা ফিরে এসে লজ্জায় কিছু বলতে পারে না। কিন্তু শীর্ণকায় গোলকের কিছুই পছন্দ হয়নি তার। সারাক্ষণ ল্যাংটো করে রেখে নিজের ডিউটি করতে লাগল। মাঝে মধ্যে তাকে দেখতে লাগল। তারপর প্রায় ঘন্টা দুই বাদে হাফ প্যান্ট পরতে হুকুম দিল। নিমু আর সদুর চিহ্ন কোথাও নেই। তারা পালিয়েছিল। গোলক জামা প্যান্ট পরে সারাটা পথ একা ফিরেছিল। সারাটা পথ তার মনে হতে লাগল, সবাই দেখেছে তাকে উদোম অবস্থায়। অথচ সেই পথ ছিল জনশূন্য। পথের অনেকটাই বিল জমিনের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। চৈত্রের দুপুরে ধানকাটা মাঠ হা হা করছিল আকাশের দিকে চেয়ে। পুরো প্রকৃতিই ছিল নেড়া। উদোম।

পরদিন নিমাই আর গুণেন খিক খিক করতে লাগল। শাসাতে লাগল, কাউকে যদি বলি, ইস্কুলের ভিতরই তারা তার প্যান্ট খুলে দেবে। আর তা নিয়ে ভয় দেখাত প্রায়ই। তার রোগা শরীরে জামা প্যান্ট ঢলঢল করত। নিমাই ক্লাসের ভিতরেই হাফ প্যান্টের তলায় হাত গলিয়ে দিত আচমকা। তারপর হা হা হাসি।

ফোন করলেন গোলক ভয় থেকে মুক্ত হতে, ডি,এস,পি-সায়েবের প্রাইভেট সেক্রেটারি শম্ভু চট্টরাজ ধরল। গোলকবিহারী যেন হালে পানি পেলেন, জিজ্ঞেস করলেন, স্যার, স্যার কোথায় দাদা ?

উনি তো বকডোবা-ঝিলিমিলিতে, সেই জন্য আমাকে রাতে বাংলো অফিসে থাকতে হচ্ছে, কাল বিকেলে ফিরবেন।

কখন গেলেন ? গোলক আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করে।

পরশু, ফ্যামিলি নিয়ে।

গোলকবিহারীর গা দিয়ে হিম স্রোত বয়ে গেল। বকডোবা-ঝিলিমিলি তো জেলার দক্ষিণে, আর ন'পাহাড়ি উত্তরপশ্চিমে। তাহলে কে এসেছিল তাঁর থানায় ? কে ওসির ঘরে

বসে হ্যান্ডবল দেখতে দেখতে হাজতঘর থেকে উড়ে আসা আর্তনাদ শুনছিল। পল্টন নায়েককে নিয়ে এসেছিল কে ?

গোলকবিহারী বলল, স্যার তো আমাদের এখানে এসেছিলেন।

কী বলছেন আপনি, স্যার ঝিলিমিলিতে রয়েছেন।

ভয় করল তাঁর, বললেন, দাদা, স্যার এখেনে এসেছিলেন বিকেলে......।

শুনতে শুনতে চট্টরাজ বলল, তুমি কি নেশা করেছ মিঃ ওসি, আমি রাখছি, স্যার ঝিলিমিলি থেকে একটু আগে ফোন করেছিলেন, ক্রাইম মিটিং ডাকতে বললেন, আজ বিকেলে ময়ুর দেখেছেন ওখানে।

সত্যি গোলক কাঁপতে লাগলেন। তাঁর এমনিতেই খুব ভয় ছিল একসময়। ছেলেবেলায় মেঘ ডাকলে ভয় পেত বালক। রাত হলে বারান্দায় একা থাকতে পারত না সে। গ্রামে তখন ইলেক্ট্রিক ছিল না। হেরিকেনের আলোয় ঘরের দেওয়ালে মস্ত ছায়া, তেল ফুরোলে দপ করে আলো নিভে যাওয়া তার শিরদাঁড়ায় হিমস্রোত বইয়ে দিত। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে অন্ধকারে কত কিছু দেখতে পেত সে। মনে হত অশরীরী কেউ তার গায়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। সে কুঁকড়ে থাকত। রাতে প্রস্রাব পেলে হতো বিপদ। তখন কাউকে না কাউকে ডাকতেই হতো। সমস্তটা মনে পড়ে এখন। সেই ফিকে জোছনা রাত। একরাতে সে একা পার হচ্ছিল উঠন। বারান্দায় খুড়তুতো ভাই দাঁড়িয়ে। উঠনের পুবদিকে কামিনী ফুলের গাছের ছায়ায় কে যেন দাঁড়িয়ে। চাঁদ পিছনে। তার ছায়া তার আগে আগে চলেছে। সে যেন তার ছায়া নয় অন্য কারোর অন্ধকার। সামনে দূরে কলাগাছের ঝাড়। সেখানে শাদা কাপড় পরে কেউ যেন দাঁড়িয়ে। যার অন্ধকার তার আগে আগে চলছিল, সে যেন হাত রাখল গোলকের কাঁধে। হিম শীতল স্পর্শ। ভয়ে সে পড়ে গেল উঠনে। তারপর সে আর কিছু জানত না। সেই ভয় চাগাড় দিল বুঝি এতদিন পর। বললেন, কানু, স্যার নাকি তিনদিন ধরে ঝিলিমিলিতে ?

কানু বলল, তাহলে কি ভূত এসেছিল ?

কানু, স্যার আমার ঘাড়ে সব ফেলে দিলেন।

হ্যাঁ স্যার, ওই লোকটা ইললিগাল মাইনিং বন্ধ করে দিচ্ছিল, কমেও গেছে অনেক, তাই মেরে দিল, আপনার বিপদ স্যার, কিন্তু মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে, যা হয়েছিল সব বলবেন, ইয়েস স্যার, আজ থেকেই।

আজ কাকে বলব ?

ম্যাজিস্ট্রেটকে বলবেন ডি,এস,পি তার ড্রাইভার দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে আপনার থানায় গিয়ে।

সত্যি মরে গেছে ভরত, আমাকে খুব বিশ্বাস করত লোকটা।

কানু বলল, মেরেই তবে ডি,এস,পি, সায়েব গেছে, থানা কাস্টডিতে মরেছে, ওসির ঘাড়েই এল সব। মাইতি তো বলল, ওসি নিজে গিয়েছিলেন লোকটাকে অ্যারেস্ট করতে, আপনি যে কেন গেলেন ?

গোলক তাঁর অফিসের গাড়ির ড্রাইভারকে অবলম্বন করতে চাইলেন যেন। বললেন, স্যারের র্অডারে, মাইতি মনে হয় জানত সব।

হ্যাঁ, জানত, টাকা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল যে, অনেক টাকা স্যার, আপনি জানেন না ?

জানি। বিড়বিড় করলেন গোলক।

মাসে মাসে একটা টাকা উপরে দিয়ে আসতে হয়, আপনি জানেন না ?

এই ড্রাইভার যে এত খেয়াল রাখে তা বোঝেননি গোলক এতদিন। মাসে মাসে যে টাকাটা উপরে পৌঁছে দিতে হয় তার সঙ্গে গোলক কোনোদিন জড়িয়ে ছিলেন না। সব থানার ওসি অন্য এস,আই, কে দিয়ে করাত। তারপর নিজে ওসি হয়ে তিনি কোনোদিন ভাবেননি মাসের টাকা দিয়ে আসার কথা। মাইতি পাঁচ বছর আছে এখানে, মাইতিই করে কি করে না তার খোঁজই করেননি তিনি। করত মাইতি। ন'পাহাড়ি খুব লোভনীয় পোস্টিং। অবৈধ খাদান থেকে কত টাকা আসে। আর আসে ক্র্যাসার থেকে। স্পঞ্জ আয়রন ফ্যাকটরি থেকে। এসব নিয়ে যে অভিযোগ আসে তা নিয়ে তিনি সক্রিয় হয়েছেন। কানু বলছে, খাদান বন্ধ হলে টাকা কী করে উঠবে ?

চুপ করে ভাবছেন গোলক। তাঁর ভুল হয়েছে। সন্ধে বেলায় কেন অ্যারেস্ট করতে গেলেন? প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন। তিনি একটা ভীতু লোক। যখন পল্টন মারছিল ভরতকে তিনি কেন আটকাতে যাননি। উপরওয়ালা থাকুক যে থাকুক, থানা তাঁর কন্ট্রোলে থাকবে। তিনি কেন লাঠি কেড়ে নেননি ? ভরত কুইলা কি ভাবেনি ওসি ন'পাহাড়ি ভালমানুষ, তাকে বাঁচাবে। ওসি ন'পাহাড়ি ভালমানুষ, তাই সে উঠে এসেছিল জিপে। এই ভালমানুষির মানে কী ? চুপ করে একটা মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করা ?

কানু বলল, ফিরে চলুন স্যার, থানায় চলুন, ভয় পাবেন না, সত্যি কথাটা বলে দিতে হবে।

তখন তাঁর ফোন বাজল। চট্টরাজ। আবার সে কেন ? চট্টরাজ জিজ্ঞেস করল, স্যারকে কী দরকার ?

স্যার এখানে এসে ছিলেন বললাম না।

কী সব বলেন ওসি ন'পাহাড়ি, স্যার ঝিলিমিলি।

সাহস র্অজন করলেন গোলক, বললেন, একটা লোককে পিটিয়ে মেরে দিয়ে চলে গেছেন স্যার, কী ভাবে আমি ফেস করব এই ঘটনা ?

কী বলছ তুমি ওসি, ন'পাহাড়ি, হি ইজ আই পি এস, আছেন ট্যুরে ঝিলিমিলি, আর ইউ জোকিং ?

স্যারকে বলে দেবেন বডি আমি রেখে দিয়ে আসব বাংলোয়।

অ্যারেস্ট হয়ে যাবে, এখন ভাবো কীভাবে এ থেকে মুক্তি পাবে।

আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্টেটমেন্ট দেব যা সত্যি।

চট্টরাজ ফোন কেটে দিল। ধরা যাচ্ছে সে ফোন করছে স্যারের নির্দেশে। স্যার বাংলোয় আছে। সত্যিই কি বডিটা বাংলোয় নিয়ে যাবেন তিনি ? তা হয় নাকি ? বডি মর্গে যাবে ময়না তদন্তে। থানা এসে গেল। গাড়ি ঢুকে গেল ভিতরে। বাইরে সেই মস্ত ভীমাকার পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসেছিল ভগবান র্বমণ, নিশ্চুপ। কিন্তু অন্ধকারে বাতাসে ভেসে ছিল......ও উড়িয়া যাও রে----ওরে বুলবুলি ময়না...

কয়া দেইস মুই কমবক্তা কান্দিয়া কাটাও নিশি......

ভগবানের ঘাড় ঝুলে পড়েছে দেখলাম। সে যেন প্রতি সন্ধ্যার মতো...। না এখন সে নিশিথের কথা বলছে নিজমনে।

সাত

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট রাজ্য সিভিল সার্ভিস থেকে প্রমোশনে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস। তিনি তিপ্পান্নয় এই পদে এসেছেন। পঞ্চান্ন হয়ে গেলে আর হতো না। সন্দীপ ঘোষ, আই,এ,এস, প্রথম জীবনে অনিন্দ্য তালুকদারের বাবা অজয় তালুকদারের অধীনে কাজ করেছেন। অনিন্দ্যকে তিনি জুনিয়র তালুকদার বলেন। স্নেহ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন গর্ভনমেন্ট সার্ভিস মানে সার্ভিস টু ইওর বস। বসের নির্দেশ মতো কাজ করলেই সার্ভিস টু দ্য পিপল হয়। ব্রিটিশ সরকারের রেখে যাওয়া আমলাতন্ত্রের কোনো পরির্বতন হয়নি। না র্দশনে না পদ্ধতিতে। অনিন্দ্য ন'পাহাড়ি থেকে ফিরে এস,পি-র অফিস হয়ে সোজা জেলা শাসকের বাংলোয় যখন প্রবেশ করলেন গাড়ি নিয়ে তখন জেলা শাসকের ঘরের মজলিশ শেষ হয়েছে। শেষ গাড়িটি চলে গেল। ফাঁকা ঘরে জেলা শাসক কিছু জরুরি ফাইলে সই করছিলেন। অনিন্দ্য গিয়ে বসল। খুব শান্ত। মাথার ঘন চুল পরিপাটি করে আচড়ানো। সিগারেটের প্যাকেট স্যারের দিকে বাড়িয়ে অনিন্দ্য বলল, স্যার একটা কথা আছে, এটা দরকার ছিল, কিন্তু একটু বেশি হয়ে গেছে।

কী করেছ, কাকে হাজতে ভরেছো ?

অনিন্দ্য ধীরে ধীরে বলল সব কথা। আসলে এমন ঘটবে ভাবেনি সে। পিটিয়ে হাত পা ভেঙে ছেড়ে দেবে ভেবেছিল। কিন্তু হয়ে গেল। পল্টনকে না থামতে বললে তো থামে না। পল্টন হলো কাসাবিয়াঙ্কা, স্যার যা বলবে তা করতেই থাকবে যতক্ষণ স্যার না থামতে বলবে। ভরত কুইলা লোকটা সমস্ত বিজনেস বন্ধ করে দিচ্ছিল। বদনাম করছিল পুলিশের। স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে চিঠি তো সে-ই লিখিয়েছিল। সব মিথ্যা অভিযোগ।

ড্রাইভারকে থামালে না কেন ? জেলা শাসক শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

আসলে মার্কিন মেয়েদের হ্যান্ডবল হচ্ছিল, আমি ওটাই দেখছিলাম, এমন ডুবে গেলাম, কী হচ্ছে বুঝতেই পারিনি।

তুমি হ্যান্ডবল দেখছিলে আর তোমার ড্রাইভার পেটাই করছিল! বিস্ময় প্রকাশ করেন জেলা শাসক। তারপর এস,পি-কে ফোন করেন। পুলিসের বড় র্কতা বললেন, তিনিই ওকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন। একটা কিছু করতে হবে তো।

আপনি আসবেন ?

আমি ওকে বলেছি যা হবে আমাকে ফোনে জানাতে, ও এখন স্টেশনের বাইরে চলে যাক, জেলার অন্য কোথাও।

অ্যাটেনডান্স ?

ও সব আপনাকে ভাবতে হবে না, আমিই ম্যানেজ করছি, ওর ফাদার ইন ল, দিল্লিতে আলাপ হয়েছিল, ক্যাবিনেট সেক্রেটারি মিঃ পি ভরদ্বাজ, তিনি কল করেছিলেন আমাকে, বাচ্চা ছেলে ভুল করে ফেলেছে, আপনাকে দেখতে বলেছেন উনি।

আচ্ছা, ভরদ্বাজ সায়েবের জামাই আমাদের অনিন্দ্য! জেলা শাসক অনিন্দ্যর দিকে ! তিনি সস্নেহে অনিন্দ্যকে বললেন, তুমি রাতেই ঝিলিমিলি চলে যাও, ফোন ধরবে না, পল্টনকে নিয়েই যাও।

অনিন্দ্য বললেন, ওক্কে স্যার, আসলে ম্যাজিস্ট্রেটের ইনকোয়েস্ট হবে তো, আপনি দেখবেন ।

চা খাবে ?

নো স্যার, আমি বিনীতাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি ঝিলিমিলি বাংলোয়, দেরি করব না।

ও, তোমার ওয়াইফ এসেছেন, আই,আর,এস তো ?

ইয়েস স্যার, ও কলকাতায় আছে, আচমকা চলে এসেছে একটু আগে নিজে ড্রাইভ করে, এসে শোনে এই ব্যাপার।

তুমি কি ভয় পাচ্ছ জুনিয়র তালুকদার ?

নো স্যার, আসলে বাইরে গ্রামের লোক বসেছিল, ওসিটা সুবিধের নয়, মনে হয় লোকগুলোকে ও-ই বসিয়ে রেখেছিল, নইলে আমি বডি থানা থেকে পল্টনকে দিয়ে তুলে নিয়ে হাইওয়ের উপর ফেলে চালিয়ে দিতাম গাড়ি।

তুমি চলে যাও, স্ত্রী এসেছেন, এইটা তোমার পক্ষে যাবে, ডোন্ট ওরি, সকলে আছে, দেখ হয়তো কিছুই হবে না, কিছু টাকা অফার করলেই হয়ে যাবে, পারবে তো।

টাকা দেওয়ার অনেক লোক আছে স্যার, বলে দিলেই হয়ে যাবে, মাইনিং যারা করছে তারাই দিয়ে দেবে।

চলে যান অনিন্দ্য তালুকদার। জেলা শাসক চুপ করে বসে থাকেন। তারপর কী মনে হতে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ডাকেন ইন্টারকমে। তিনি এক মধ্যবয়সী ক্লার্ক।

২৫ বছর চাকরি হয়ে গেছে, খুব পাটোয়ারি। এসে দাঁড়াতে বললেন, বসো, বলতে পার কোন ডেপুটিকে রাতে পাঠানো যাবে ন'পাহাড়ি, ওখানকার বিডিও তো নেই।

জয়েন্ট বিডিও চার্জে আছে। রমেশ কর বলল, তার তো পাওয়ার নেই ম্যাজিস্ট্রেটের।

ন'পাহাড়ি ঘন্টা দেড় লাগে, দশটা-সাড়ে দশটায় স্টার্ট করলে হবে। বললেন ডি,এম।

রাতেই ?

হ্যাঁ, স্পেশাল কেস, রাতেই করতে হবে, প্রোমোটি অফিসার কতজন ?

কেরানিবাবু রমেশ কর বললেন, যে কোনো প্রমোটি অফিসার হবে না স্যার, তেমনি আছে সাতজন, রিটায়ারমেন্টের মুখে এসে গেছে প্রায়, তাদের সামনে আর কোনো লিফট নেই, লিফটের সম্ভাবনা থাকলে......কথা শেষ না করে ছেড়ে দিল রমেশ কর।

জেলা শাসক চমৎকৃত হলেন। রমেশ ধরে নিয়েছে তাঁর কথার নিহিত র্অথ। প্রমোটি অফিসার মানে অন্য সার্ভিস থেকে স্টেট সিভিল সার্ভিসে আসা অফিসার। কালেকটরিতে চালু আছে, এই সব অফিসার খুব র্কমদক্ষ হন, আবার এঁদের বেশিরভাগ অংশকে দিয়ে যে কোনো কাজ করানো যায়। সবচেয়ে কঠিন আর দায়িত্বর্পূণ কাজ এঁরাই করেন। এঁদের দরকারে ঘর ঝাঁট দেওয়ানোও যায়। আবার আইনও এঁরাই ভাল জানেন বহুদিনের অভিজ্ঞতার জন্য। তাই রাতে এঁদের র্মগে সুরৎহাল করাতে পাঠানো কঠিন। সূর্যাস্তের পর এই কাজ হয় না। বেলা চারটের পর বিধি নেই এই কাজ করা। শুধু মাত্র সামনে কোনো লিফট থাকলে যেতে পারে। অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে ম্যাজিস্ট্রেটের সুরৎহাল রির্পোট খুব গুরুত্বর্পূণ। যে অফিসার নিজেদের মতো করে তা করতে রাজি হবেন, তাঁর তো কোনো না কোনো বাসনা পূরণ হওয়ার বিষয় জড়িয়ে থাকবে। জেলা শাসক বললেন, সামনে প্রমোশন আছে এমন কেউ।

তিনজন আছে স্যার, সামনে এস,ডি,ও হবেন তিনজন।

তাদের থেকে একজনকে সিলেক্ট করে নাম্বারটা দাও, ফাইল র্অডার করে তার জন ফোটো কপি দিয়ে দিও।

ইয়েস স্যার।

বলে পাঠাও ডি,এম, কে ফোন করতে।

ইয়েস স্যার, সুবল রায়কে বলছি, উনি এস,ডি,ও হচ্ছেন সবার আগে।

গুড, এস,পি-র অফিস যেন দুটো সিকিউরিটি দেয়, এত রাতে আমার ম্যাজিস্ট্রেট যাবে এনক্যোয়ারিতে।

আমি মেইল করছি, আর ফোনও করছি স্যার, সুবল রায় সায়েবকেও আসতে বলছি তাড়াতাড়ি, আপনি কেসটা ব্রিফ করবেন তো।

সুবল, খুব ঠান্ডা প্রকৃতির, তাই তো, অ্যাডিশনাল ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফিসার, গুড অফিসার, ওকে ডাকো, ডেকেই আনো। বলে জেলা শাসক তাঁর সামনের ল্যাপটপ

খুলে বসলেন। রমেশ কর চলে গেল। জেলা শাসক প্রমোশনে প্রমোশনে এতদূর এসেছেন। আগে থেকেই সামনের দিনের কাজ দেখতে পান। খুব পরিকল্পনা করে কাজে হাত দেন। বুঝতে পারছিলেন অজয় তালুকদারের ছেলে, ক্যাবিনেট সচিবের জামাতাকে এই অপরাধ থেকে মুক্ত করতে হবে। মিঃ ভরদ্বাজ চিফ সেক্রটারি হয়ে আসবেন এই রাজ্যে, এমন একটা কথা বাতাসে ভাসছে। ওই পরিবার সরকারের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত। চাপ আসবেই। অনিন্দ্য এর ভিতরেই ঘটনাটি ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। অনিন্দ্য কি এমনি এসেছিল তাঁর কাছে। সুরৎহাল রিপোর্ট যাতে ঠিক থাকে তা বলতেই এসেছিল। সব দিকে বেঁধে রাখছে। নিজেকে দেখাবে ঝিলিমিলিতে ছিল। যায়নি ন'পাহাড়ি। ওসির ঘাড়ে দোষ চাপবে। তিনি নেট খুলে ওসির নামটি দেখলেন। চেনা কি ? অনিন্দ্য কাজটা খারাপ করেছে। কিন্তু শাসন রাখতে হলে এসব কাজ হয়ে যায়। তাঁর মনে পড়ল, তিনি তখন ডায়মন্ড হারবার মহকুমায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ডায়মন্ড হারবার থানায় পুলিশ হাজতে একটি লোক গলায় দড়ি দিয়ে মারা গিয়েছিল। তিনি মহকুমা শাসকের র্অডারে থানায় গিয়ে দেখেছিলেন, গলায় দড়ি অথচ পা লেগে আছে মাটিতে। পা মাটিতে ঠেকে গেলে গলায় দড়ি দিয়ে মরা যায় না। জানালায় দড়ি বেঁধে কাজটি করা হয়েছিল। হাজতে পিটিয়ে মেরে ফেলার পর ওসি ওই কাজটি করেছিল। তাঁর রিপোর্টে ওসি বেঁচে গিয়েছিল। কাজটা অবশ্য ওসি করেনি নিজ হাতে। কনস্টবলকে দিয়ে করিয়েছিল। অনেকটা এই রকম। এখানে প্রাথমিক কাজ হলো অনিন্দ্য তালুকদারকে সমস্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত করতে হবে। তাকে সেফ রাখতে হবে। ফোন বাজল। অচেনা নম্বর। তিনি ধরলেন, সন্দীপ ঘোষ স্পিকিং।

মহিলার কণ্ঠস্বর, আমি অজন্তা গুপ্তা, আপনি আমাকে চেনেন মিঃ ঘোষ, আমি আপনার ট্রেনিঙে মুসৌরিতে লেকচার দিতে গিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, ম্যাম, আপনার মনে আছে ?

আছে, ফাইল ঘাঁটতে গিয়ে আপনার নাম পেলাম, ভাল আছ সন্দীপ?

সন্দীপ ঘোষ বুঝতে পারছিলেন আবার অনিন্দ্য তালুকদারের কথা এসেছে। ইনি তাঁকে অনায়াসে তুমি সম্বোধন করলেন। ইনি অনিন্দ্যর কে ? মুসৌরিতে তাঁর আই,এ,এস, ট্রেনিং হয়েছিল এই তো দু'বছর আগে। সেখানে ইনি লেকচার দিয়েছিলেন কি না তাঁর মনে নেই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ম্যাম, আপনি এখন কোথায় আছেন ?

আমি ছত্তিশগড় গর্ভনমেন্টে আছি, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কালচার, অ্যান্ড অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি, বল কেমন আছ?

ঘেমে গেলেন সন্দীপ ঘোষ, বললেন, আছি ম্যাম, ভালই আছি।

আর কবছর আছে ?

চার বছর।

আফটার রিটায়ারমেন্ট কী করবে?

ঠিক করিনি ম্যাম। জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন।

কিপ ইন টাচ, শোনো জুনিয়র তালুকদার আমার দিদির ছেলে, আমি ওর মাসি, দিদি ফোন করেছিল কী যেন একটা হয়েছে ওই ডিস্ট্রিক্টে ?

সন্দীপ এবার মনে মনে বিরক্ত হলেন । নানা কোন থেকে ফোন করে একই ঘটনা নিয়ে সর্তকই যেন করা হচ্ছে তাঁকে। এর মানে অনিন্দ্য তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। প্রশাসনের দুইটি ডানা। পুলিস এবং সিভিল সার্ভিস। দুইয়ের ভিতরে একটা অদৃশ্য দ্বন্দ্ব আছে। কার ক্ষমতা বেশি তাই নিয়ে সন্দেহ আছে গোপনে। কিন্তু সিভিল সার্ভিস এই বিষয়ে এগিয়ে তো সত্য। পুলিসকে গুলি চালাতে হলেও তো ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিতে হয়। এস,পির সি,সি,আর-জেলা শাসক এই কিছুদিন আগেও সুচনা করতেন। এখন অবশ্য তা আর হয় না। কিন্তু পুলিশের সমস্ত কাজেই ম্যাজিস্ট্রেটের রির্পোট সব সময় গুরুত্বর্পূণ। সন্দীপ একটু নীরব থেকে বললেন, ম্যাম, আমি দেখছি কী করা যায়।

ওক্কে সন্দীপ, আমি পরে ফোন করব।

ইয়েস ম্যাম।

দ্যাখো, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে এই সমস্ত ঘটনার কোনো গুরুত্বই থাকার কথা নয়, পুলিস ক্যান ডু এভরি থিং, কিছু এলিমেন্টকে না মারলে অ্যাড মিনিস্ট্রেশনই চলে না, জামিনে বেরিয়েই আবার তার কাজ আরম্ভ করে দেয়।

ইয়েস ম্যাম।

ওক্কে, যোগাযোগ রেখো। বলে ফোন কেটে দিলেন অজন্তা গুপ্তা। সন্দীপ ঘোষ তাকিয়ে আছেন তাঁর মোবাইলের দিকে। আবার কে ফোন করবে? অজয় স্যার, না ক্যাবিনেট সচিব ভরদ্বাজ সায়েব? তিনি চেম্বার ছাড়লেন। এইটি তাঁর বাংলো অফিস। উপরে বসবাস। মেয়ে এম,এ, পড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কদিনের ছুটিতে এসেছে। মেয়ে সম্বিতা ডাকছিল, বাবা, আর কত সময়, উপরে এস।

আট

সন্দীপ উপরে উঠতেই ফোন এল সুবল রায়ের। রমেশ কর এর ভিতরেই ফোন করেছে তাকে। তিনি সুবল রায়কে বললেন, ডিনার করে বাংলোয় আসতে। একটা জরুরি ইনকোয়েস্ট আছে। রাতেই যেতে হবে। সুবল রায় ইয়েস স্যার, স্যার, স্যার করতে থাকে টেলিফোনের ওপারে। সিভিল সার্ভিস ২৪ ঘন্টার। যখন খুশি তোমাকে কাজে পাঠাতে পারে প্রশাসন। না হলে, আইন-শৃঙ্খলা, দাঙ্গা, বন্যা আর নির্বাচনের সময় প্রশাসন সক্রিয় হবে কী করে ? ফোন কেটে দিয়ে তিনি চুপ করে বসে থাকলেন। টিভি চলছে। সাউন্ড মিউট করা আছে। উত্তরবঙ্গে একটা স্কুলের মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে রেপ করে মেরে ফেলে দিয়ে

গেছে ধানক্ষেতে। তিনি তাঁর স্ত্রী সুমনাকে বললেন, কাল আমাদের এখানেও এজিটেশন হতে পারে, চারদিকে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছে।

বাংলোয়, কেন ? সুমনা ভয় পেলেন।

না, রাস্তা অবরোধ হতে পারে, একটা ঝামেলা পাকিয়ে ঝিলিমিলি চলে গেছে অনিন্দ্য তালুকদার, মিডিয়া জানতে পারলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কে অনিন্দ্য ? ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে সম্বিতা।

ডি,এস,পি, ক্যাবিনেট সচিবের জামাই। বলে তিনি বিড়বিড় করলেন, ওসির চাকরি যাবে এরা যেভাবে ঘটনা সাজাচ্ছে।

তাই ! বিস্মিত হলেন সুমনা, ছেলেটি খুব ভালো, বড় ঘরের মেধাবী, ও কী করল আবার ?

সম্বিতা জিজ্ঞেস করেছে, কী হয়েছে বাবা ?

সন্দীপ বলবেন না বলবেন না করে ধীরে ধীরে বললেন যা শুনেছেন। ব্লক মেডিকাল অফিসারের মেইল তাঁর কাছে ফরোয়ার্ড করেছে চিফ মেডিকেল অফিসার, হেলথ। তার ভিতরে ম্যাজিস্ট্রেট এনক্যোয়ারির কথাও বলেছেন তিনি। তারপর বডি মর্গে পাঠানো হবে। থানা থেকেও একটি মেইল এসেছে এস,পি, হয়ে ডি,এম-এর কাছে। মর্গে বডি পাঠাবে তো থানা। শুনতে শুনতে বছর তেইশের সম্বিতা বলল, এটা তো সিম্পল মার্ডার কেস বাবা, তুমি কেন চাপ নিচ্ছ ওই ডি,এস,পি, লোকটার জন্য?

আমি কেন চাপ নেব, কিন্তু জেলা শাসক হিশেবে আমার র্কতব্য তো আমাকে করতে হবে, প্রশাসনিক কিছু নিয়ম পালন তার ভিতরেই আছে?

মেয়ে একটু চুপ করে থাকে। শাদা শালোয়ার কামিজ, মাথা ভরা রেশমি চুল, তাঁর মেয়েটি তাঁর মায়ের মুখ পেয়েছে। স্নিগ্ধ। এখন পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছে, তারপর কী করবে তা ও-ই জানে। মেয়ে এসে তাঁর পাশে বসল, এই সব ঘটনা খবরের কাগজে পড়ি, খুব ছোট করে থাকে, ইজ ইট রিয়েল, হ্যান্ডবল দেখতে দেখতে একটা মানুষকে মেরে ফেলা, কী ভয়ানক ওই লোকটা।

অন্যায় করেছে। সন্দীপ ঘোষ অস্ফুট গলায় বললেন।

পানিশমেন্ট হবে ? সম্বিতা জিজ্ঞেস করল।

তখন নিচ থেকে রমেশ কর ফোন করল, স্যার, অ্যাডিশনাল ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফিসার সুবল রায় সাহেব এসে গেছেন।

সন্দীপ উঠলেন। কত বড় এই বাংলো। ব্রিটিশ আমলের এই বাংলোয় কত জায়গা! দোতলার ব্যালকনি একটি প্রমাণ মাপের ঘরের মতো। লিভিং রুমে ছোটরা ফুটবল খেলতে পারে। নিচের অংশও তেমন। ৫০ ফুট লম্বা আর ৪০ ফুট চওড়া জেলা শাসকের ঘর। এই অফিস চেম্বারে প্রবেশের দুটি দরজা। একটি তাঁর নিজস্ব, অন্যটি ভিজিটরের। তিনি কখন

তাঁর চেম্বারে প্রবেশ করেন, বাংলোর অফিসের কেউ টের পায় না। তিনি নিঃশব্দ পায়ে প্রবেশ করলেন ভিতরে। সুবল বসে আছে। বছর তিপ্পান্ন। সুবল ছিল এল,আর, সার্ভিসে। পরে সিভিল সার্ভিসে আসে স্পেশাল এক্সাম দিয়ে। তখন সেই সুযোগ ছিল। নানা দপ্তর ঘুরে, অনেক দিন উত্তরবঙ্গে কাটিয়ে নিজের জেলায় এসেছে সুবল। সামনেই তার প্রমোশন। এস, ডি,ও---মহকুমা শাসক। এখনো সাতবছর আছে। মহকুমা শাসক থেকে আর উপরে উঠতে পারবে না, কিন্তু এই সাত বছর মহকুমার অধির্কতা হয়েই থাকবে। এই ধরনের সরকারি অফিসারের কাছে এস,ডি,ও হওয়া এক স্বপ্ন। জেলা শাসক দূরে, মহকুমায় মহকুমা শাসকই সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদ। ক্ষমতা সব তাঁর কাছেই কেন্দ্রীভূত থাকে। সুবল খুব গম্ভীর মুখে বসে আছে। এত রাতে ডি,এম, ডেকেছেন, সে কৃর্তাথ। সন্দীপ ঘোষ দেখলেন, ভবিষ্যতের মহকুমা শাসক বসে আছেন। তিনি হেসে বললেন, তোমার এস,ডি,ও, প্রোমোশন তো সামনে।

ইয়েস স্যার।

মিটিং খুব শিগগির হবে।

ইয়েস স্যার।

গ্রেডেশন লিস্টে তুমি তো পাঁচ নম্বরে আছ।

ইয়েস স্যার। সুবল আনন্দিত হলেন ডি,এম, তার খোঁজ রাখেন জেনে।

সন্দীপ বললেন, ভ্যাকেনসি আছে, হয়ে যাবে, যদি না কোনো রির্পোট থাকে, এ,সি,আর, পুলিস রির্পোট।

পুলিস রির্পোট তো জয়েনিঙের সময় নেয় স্যার।

এস, ডি,ও, পোস্টটা তো খুব বড়, সব দিক দেখে নেওয়া হয়, কোন জায়গায় পোর্স্টিং হবে, তাও ইমপরট্যান্ট।

সন্দীপ ঘোষ বানিয়েই বলছিলেন। পুলিস রির্পোট কেন থাকবে? কিন্তু এমনভাবে ব্যাখ্যা করলেন যেন বিষয়টি খুবই গুরুত্বর্পূণ। এবং একেবারেই গোপনীয়। এবং তাঁর উপর র্নিভরশীল। সরকার সব দিক খতিয়ে দেখেই মহকুমা পোর্স্টিং দেয়। তারপর বললেন, ডোন্ট ওরি, ইউ আর আ গুড অফিসার, ইউ উইল গেট ইওর লিফট, কোনো রিপোরটেই কিছু আটকাবে না।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। গলে গেলেন সুবল রায়, ডেপুটি। বললেন, কেন ডেকেছেন স্যার?

একটা ম্যাজিস্ট্রেট এনক্যোয়ারি করতে হবে, গুরুত্বর্পূণ কেস, বডি রয়েছে ন’পাহাড়ি ব্লকে, পুলিস কাস্টোডিতে মৃত্যু।

রাতেই ? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সুবল রায়।

বডি তো তদন্তের পর মর্গে যাবে পোস্টমর্টেমের জন্য, সব কিছুরই তাড়া আছে, তাড়াতাড়ি সব কাজ শেষ করে পুড়িয়ে দিতে হবে, লোকটা অ্যান্টিস্যোসাল, ওর বিরুদ্ধে রেপ কেসের চার্জও ছিল, ফেলে রাখলে ঝামেলা বাড়াবে কোল মাফিয়ারা।

সুবল আর কিছু বললেন না। কী বলবেন। ঘ্রাণ শক্তিই একজন ভারতীয় বা রাজ্য সিভিল সার্ভিস অফিসারের ভবিষ্যতের ভাল মন্দের নির্ণায়ক। তিনি বুঝলেন, জেলা শাসক চাইছেন যখন তা মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। তিনি বিশ্বাস করেন, সাহেবের কথা মান্য করাই সার্ভিস টু দ্য পিপল। যা বলবেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারার ভিতরে একটা তৃপ্তি আছে। এই জন্য কলিগদের অনেকে তাকে কর্তাভজা সুবলসখা বলে। ডি,এম, সাহেব তখন তাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন কীভাবে রিপোর্ট করতে হবে। তিনি অনিন্দ্যর পরিচয় দিলেন, তার জন্যই সুবল রায়কে ডাকা। সুবল বলল, উনি খুব বড় ফ্যামিলির ছেলে শুনেছি।

ব্রিলিয়ান্ট অফিসার, ওদের ফ্যামিলিটাই আই,এ,এস আর আই,পি,এস-এর, দে আর সারভিং গর্ভনমেন্ট ফর আ লং পিরিয়ড।

আই নো স্যার। সুবল বললেন।

ডি,এম সাহেব তখন অজয় তালুকদার, পি ভরদ্বাজ, অজন্তা গুপ্তাদের পরিচয় দিলেন, বললেন, অনিন্দ্যকে সেভ করতে হবেই, মিঃ ভরদ্বাজ চিফ সেক্রেটারি হয়ে আসছেন শুনেছি, তিনি আমাকে ফোন করেছিলেন, ইনজুরি মিনিমাম দেখিও সুবল, বলা যাবে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে।

স্যার! সুবল রায়ের গা ছমছম করে ওঠে। সুবল সৎ অফিসার। তাঁদের পরিবারে তিনিই প্রথম সরকারি অফিসার। তাঁর দাদা ইস্কুল টিচার, ভাই একটা ছোট দোকান করে। তিনি নিজের অংশের পৈতৃক জমি দুই ভাইকে দিয়ে দিয়েছেন। এই জেলা শহরে কোনো রকমে একটি বাড়ি করেছেন। ছেলে কেমিস্ট্রি অর্নাস পড়ে। মাঝারি মানের। তাকেও তৈরি করছেন সিভিল সার্ভিসের জন্য। গ্রাজুয়েট হয়ে গেলেই বসাবেন। সুবল ভাবলেন বলেন, এটা কি ঠিক হবে স্যার, কিন্তু বলতে পারলেন না। উপরওয়ালার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করা একধরণের অনাস্থা প্রকাশই। তিনি চুপ করে থাকলেন। কিন্তু জেলা শাসক বোধ হয় কিছু আন্দাজ করলেন, বললেন, এস,পি- নিজেই বলছেন হার্ট অ্যাটাক, আর ঘটনাও তাই, দেখবে, তেমন ইনজুরি নেই।

আচ্ছা স্যার।

ইনজুরি হওয়ার আগেই তো হার্ট অ্যাটাক। জেলা শাসক বললেন।

ইয়েস স্যার।

দেখো, আইন আদালত লং প্রসেস, অপরাধী জামিনে বেরিয়ে এসে আবার সেই ঘটনা ঘটায়, রেপ, মার্ডার।

ইয়েস স্যার, কিন্তু কিছু করার নেই, জুডিসিয়ারি অনেক কাজ আটকে দেয়। বললেন সুবল।

দেখো, বিষাক্ত সাপকে মেরে না ফেললে বিপদের আশঙ্কা থাকে।

ইয়েস স্যার।

একটি বা দুটি ইনজুরি থাকতে পারে হয়তো বডিতে।

ইয়েস স্যার।

রির্পোট কালই দিয়ে দেবে, কোর্ট পুলিসের চেয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে বিশ্বাস করে বেশি।

জানি স্যার। সুবল বললেন। তিনি এই গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারী জেলা শাসকের সঙ্গে আগে কখনো এত সময় কথা বলার সুযোগ পাননি। নিজেকে খুব গুরুত্বর্পূণ মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তিনি এই জেলা প্রশাসনের অনেক মাথার একটি। গুরুত্বর্পূণ কাজে ডি,এম, তো তাঁকেই ডেকেছেন। অন্য কারো কথা তাঁর মনে পড়েনি। এই রাত্রি তাঁর কাজের স্বীকৃতি। ডি,এম বললেন, এমন ভাবে রির্পোট দেবে যেন কোনো প্রশ্ন না ওঠে।

ইয়েস স্যার।

আমি ভরদ্বাজ সায়েবকে তোমার নাম দিয়ে দিই, উনি হয় তো তোমাকে ফোন করতে পারেন।

ইয়েস স্যার, আপনি তো বলেই দিলেন কী করতে হবে।

তবুও, তাঁর সান ইন ল তো তালুকদার, মিঃ ভরদ্বাজ চিফ সেক্রেটারি হয়ে আসবেন, বুঝতে পারছ ?

হ্যাঁ স্যার। সুবল ঘড়ি দ্যাখেন।

হ্যাঁ, এবার বেরিয়ে পড়, সিকিউরিটি দেবেন এস,পি।

ফাইল হাতে রমেশ কর ঢুকল ভিতরে, বলল, দুজন আরম র্গাড পাঠিয়েছেন এস,পি, সায়েব, রায় সায়েব এবার বেরিয়ে পড়তে পারেন।

বলতে বলতে সে ফাইল মেলে ধরে জেলা শাসকের সামনে। তিনি সই করলে সুবল রায়কে দিয়ে সিন করায়। সুবল সই করে উঠে দাঁড়ান, আমি তাহলে যাই স্যার।

তাহলে কী হলো, একটি বা দুটি ক্ষত, আর কিছু না, হাত পায়ের ইনজুরিতে মানুষ মরে না, রক্তপাত হয়নি......শুনতে শুনতে সুবল রায় ডি,এম-এর চেম্বার থেকে বের হতে একটু সময় নিলেন। অনেক বড় তো এই ঘর। তাঁর কানের কাছে জেলার সর্বাধিনায়কের কণ্ঠস্বর ভেসে থাকল। মনে হলো না গিয়েও সে লিখে দিতে পারে তদন্ত রির্পোট। ডি,এম, সায়েব তো লিখেই দিয়েছেন মনে হয়। সে শুধু স্বাক্ষর করবে। না, কিছুই হয়নি ঘটনাটা।

নয়

উপরে উঠতে উঠতে ফোন পেলেন সন্দীপ ঘোষ, জেলা শাসক। অনিন্দ্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পৌঁছে গেছ ?

নো স্যার, অন দ্য ওয়ে।

আচ্ছা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রওনা হয়ে গেছে ফর ইঙ্কোয়েস্ট।

আমি কি ওঁকে ফোন করতে পারি।

দরকার নেই, আমি ব্রিফ করেছি কী লিখতে হবে, কী ভাবে লিখতে হবে।

তবুও।

না, তুমি এর ভিতরে থেক না, বলেছি ভরদ্বাজ সাহেবের ফোন এসেছিল, ভরদ্বাজ সাহেবের নাম শুনেই ও অভিভূত, আমি ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি সমস্ত বিষয়টা।

ফোন কেটে গেল। কিংবা অনিন্দ্য তালুকদার কেটে দিল হয় নিশ্চিন্ত হয়ে, না হয় উদ্বেগ আর অস্থিরতায়। তিনি উপরে উঠে দেখলেন ডিনার টেবল সাজাচ্ছে কাজের মেয়েটি। ও থাকে বাংলোর পিছন দিকে প্রাচীরের গায়ে ঘর বেঁধে। ওর স্বামী এই বাংলোর মালী। বিঘে পাঁচ জমি নিয়ে জেলা শাসকের এই আবাস। ব্রিটিশ আমলে শ্বেতাঙ্গ শাসকের ক্ষমতার পরিমাণ বোঝাতেই যেন এর এতখানি বিস্তার। সামনের ঘাসের জমির একধারে ব্যাডমিন্টন কোর্ট, আর অন্যধারে প্রাচীর ঘেষে অনেক গাড়ির গ্যারেজ, তার সামনে ভিজিটরদের গাড়ি দাঁড়ায়। ব্যাডমিন্টন কোর্ট পড়েই থাকে। কে খেলবে ? জেলা শাসক চাইলে অতিরিক্ত জেলা শাসক, সদর মহকুমা শাসক গা গরম করতে সন্ধের পর খেলতে আসতেই পারেন, কিন্তু সে অবসর সন্দীপ ঘোষের নেই। ব্যাডমিন্টন কোর্টের পর যে পড়ে থাকা অর্ধচন্দ্রাকার জমি বাংলোর পেছনে গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে, সেখানেই মালীর কাজ। মালীর নাম সীতারাম। সে ফুল ফোটায়, শীতের ফসল ফলায়, তারপর লাউ, ঝিঙে ফলায়। এখনো তার ক্ষেতের ফুল কপি, টমেটো শেষ হয়নি। সার ছাড়াই ফসল ফলায় সে। স্বাদ আলাদা। জেলা শাসক ভিতরে গিয়ে তাঁর পোশাক ছাড়লেন। পায়জামা আর পাঞ্জাবী পরে সম্বিতার বাবা হয়ে গেলেন। ওয়াশ রুমে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে ডিনার টেবলে এসে বসলেন। মেয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। বলল, তুমি কী বুঝিয়ে দিয়েছ বাবা, কাকে বুঝিয়ে দিয়েছ কীভাবে কী লিখতে হবে ?

মেয়ে বড় হয়ে গেছে তাঁর অজ্ঞাতে। মেয়ে ওই ঘটনা শোনার পর তাঁর কথায় যেন কান পেতে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ছাত্র রাজনীতি করে ? রেজাল্ট তো ভাল। তিনি বললেন, ডেপুটি গেল এনক্যোয়ারি করতে, কী করতে হবে ব্রিফ করতে হয় আমাদের, তুই ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস দিবি, বুঝবি কত কিছু জানতে হয়, কত ভাবে সামাল দিতে হয়, প্রশাসক তার সাবঅরডিনেটদের পাশে থাকবেন সব সময়, না হলে প্রশাসন চালাবেন কী করে?

সম্বিতা জিজ্ঞেস করল, বাবা, তোমাকে কে ফোন করল এখন, ডি,এস,পি, দ্যাট ব্লু ব্লাড অফিসার ?

সন্দীপ অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। মেয়ের তো অসম্ভব ঘ্রাণ শক্তি। তাঁর অলক্ষ্যে বিষয়টি বুঝে নিচ্ছে। তিনি এড়িয়ে যেতে চাইলেন, কেন ?

তোমাকে নিয়ে আমরা বেড়াতে যাব রাজস্থান, এই সময়ও যাওয়া যায়, তুমি যাবে তো?

কখন প্ল্যান হলো ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি তো জানি না।

জাস্ট, এখুনি ভাবলাম, তোমাকে যেতে হবেই, ছুটি নাও।

হা হা করে হাসলেন সন্দীপ, আরে আমি হলাম জেলা শাসক, ছুটি বললেই ছুটি হয়, সি,এম অবধি যাবে, অ্যাপ্রুভ হয়ে আসাই কঠিন।

তোমাকে ডি,এম, হয়ে থাকতে হবে না, বাবা, তুমি ওই লোকটাকে শেলটার দিও না।

বললাম না সাবঅরডিনেটদের পাশে থাকা উচিত।

তুমি কি তাকে বাঁচানর চেষ্টা করছ? সম্বিতা জিজ্ঞেস করে।

তুই তো সবটা জানিস না, আমি আইনের পথ বাতলে দিয়েছি, তার বেশি কিছু না।

তুমি আমার বাবা, তুমি খারাপ লোকের পাশে থাকবে না।

কী বলছিস তুই বুবুন, প্রশাসনে যখন যাবি, বুঝবি।

বুবুন-সম্বিতা বলল, তুমিই তো তখন বললে একজন ফেঁসে যাচ্ছে।

সন্দীপ খুব ঠান্ডা মাথার মানুষ, বললেন, আজই ঘটেছে, সমস্তটা আমি জানি না বুবুন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এনক্যোয়ারি রির্পোট দিলে কিছুটা বোঝা যাবে।

সম্বিতা চুপ করে থাকে। মনে হয় দম নিচ্ছে। মেয়ে যে এত বড় হয়ে গেছে তার খোঁজ তাঁরা রাখতেন না। এত ওর কৌতুহল ? এই ভাবে ভাবা যে বিপজ্জনক তা ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তিনি বললেন, তুমি সমস্তটা বুঝবে না বুবুন, আমি এই জেলার দায়িত্বে, এর আইন শৃঙ্খলা আমাকে দেখতে হয়, প্রশাসন ব্যাপারটা খুব জটিল, তা না বুঝলে তোমার মনে হবে তোমার বাবা বোধ হয় কাউকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে অন্যায় ভাবে।

স্যরি বাবা, তুমি যদি তা ভাব, আমি সেই রকম কথা বলছি না, কিন্তু তুমি যে এনক্যোয়ারি রিপোরটের কথা বলছ, তুমি তো তাকে বলে দিয়েছ কী লিখতে হবে, কী ভাবে লিখতে হবে।

ধরাই পড়ে গেছেন সন্দীপ ঘোষ। কথাটা শুনেছে বুবুন, তিনি চুপ করে থাকলেন। তখন সুমনা বললেন, বাবাকে খেতে দাও বুবুন, তুমি এখন সবটা বোঝ না।

বুবুন বলল, স্যরি বাবা, আমি আর কিছু বলব না, কিন্তু আমার খারাপ লাগছে ভেবে যে আমার বাবা একজনকে আড়াল করতে চাইছে, ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে দিয়েছে কী লিখতে হবে, একটা ঠান্ডা মাথার খুন কি আড়ালে চলে যাবে?

উফ বুবুন, কেউ একটা ভুল করতে পারে, তার পাশে দাঁড়াতে হয়। সুমনা এবার স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। বুবুন-সম্বিতা আর কোনো কথা বলল না। নিঃশব্দে ডিনার শেষ হলো। তারপর বুবুন তার ঘরে ঢুকে গেল গম্ভীর মুখে। পিট সিগার বাজিয়ে দিল কম্পিউটারের সাউন্ড সিস্টেমে, দিজ ল্যান্ড ইজ ইওর ল্যান্ড... অ্যাজ আই ওয়েন্ট ওয়াকিং আপ......হাই ওয়ে...আই স অ্যাবাউট মি এন্ডলেস স্কাইওয়ে......... দিস ল্যান্ড ইজ মাই ল্যান্ড......দিস ল্যান্ড ইজ ইওর ল্যান্ড... গমগম করে উঠল ঘর। ব্যালকনিতে চুপ করে বসেছিলেন সন্দীপ ইজি চেয়ারে। সামনে অন্ধকার উদ্যান। ঘড়ি দেখলেন মোবাইলে। মিনিট পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেল। আর আধঘন্টাটাক লাগবে ন'পাহাড়ি পৌঁছতে। ভাবলেন ফোন করবেন একবার সুবল রায়কে। যা দেখবে তাই লিখবে। দায়িত্ব তো তোমার। জেলা শাসক কি তোমাকে লিখিত আদেশ দিয়েছেন কী লিখতে হবে ? ফোন করে স্বাধীন ভাবে কাজ করার কথা ম্যাজিস্ট্রেটকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া তাঁর র্কতব্য। তখন তাঁর মোবাইল বাজল। সুবল রায়। পৌঁছে গেল নাকি ? না, সুবল এখন শালুক পাহাড়ি পার হচ্ছে। এখনো বিশ কিলোমিটার হবে। বলো, কিছু বলতে চাও ?

কথাটা বললেন শুরু করার জন্য। কী শুরু করবেন ? তাঁর র্কতব্য পালন। ম্যাজিস্ট্রেট নিজে যা দেখবে তাই লিখুক। তিনি মনে মনে ভেঁজে নিয়েছেন তাঁর কথা, কী কথা, না, তখন বাংলোয় ওই নির্দেশের একটা কারণ ছিল, পরে শুনো সুবল। আসলে তুমি নিজের মতো করে রির্পোট দেবে। ওসির বয়ান নেবে। থানার অন্য কনস্টবল, এস,আই, এ,এস,আইয়ের বয়ান রের্কড করবে, সাইন করাবে তাদের স্টেটমেন্ট। তুমি সবই জানো। আমি বাংলোয় যা বলেছি ভুলে যাও।

স্যার, আমি অ্যাডিশনাল এল,এ,ও বলছি, সুবল রায়, মিঃ ভরদ্বাজ ফোন করেছিলেন স্যার, আমাকে বললেন কলকাতায় গিয়ে নেক্সট উইকে দেখা করতে।

মিঃ পি, ভরদ্বাজ, ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ?

ইয়েস স্যার, উনিএখন কলকাতায়, আমার সম্পর্কে সব জানেন, উনি তো নেক্সট চিফ সেক্রেটারি, সি,এম, ওঁকে চেয়েছেন।

কখন ফোন করলেন ?

জাস্ট, উনি ফোন রাখতে আমি আপনাকে ফোন করছি স্যার।

সন্দীপ ঘোষ বুঝতে পারলেন সুবল রায় উদ্বেলিত, উত্তেজিত। তিনি আর ওকে বোঝাতে পারবেন না। আর একটু আগে, মিঃ ভরদ্বাজের আগে ফোন করতে পারলে তাঁর কোনো দায়িত্ব থাকত না। তিনি সামলে নিতে পারতেন সমস্তটা। তীর বেরিয়ে গেছে। ক্যাবিনেট সেক্রেটারির ফোন পেয়েছে সামান্য ডেপুটি। হয় না। ঈশ্বর কি পথের শিশুর কাছে মুখ দেখান? ওসব হয় গপ্পো উপন্যাসে। সুবল রায় তো প্রোমোটি অফিসার, রাজ্য সিভিল সার্ভিসে এদের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু সরাসরি অফিসার আর প্রোমোটেড

অফিসারে বেতন এখন বৈষম্য আছে। আগে এটা ছিল না। তাই মর্যাদায়ও বৈষম্য হয়েছে। সে কোনোদিন ওই জাতীয় পদ মর্যাদার অফিসারের মুখোমুখি হতে পারবে? ভয়েই কুঁকড়ে মরে যাবে। আন্তন চেকভের একটা গল্প আছে, কেরানির মৃত্যু। উপরওয়ালার ধমকানিতে চাকরি যাওয়ার ভয়ে কেরানি মরেই গিয়েছিল। এই সব ডেপুটি সেই কেরানির চেয়ে বেশি কী ? মিঃ ভরদ্বাজ ফোন করেছিলেন তাকে, তাতে সে অসম্ভব উত্তেজনায় ফুটছে। পরের সপ্তাহে ভরদ্বাজ সাহেব তার সঙ্গে দেখা করবেন, এই সংবাদটি জেলা শাসককে দিল সে। শেষে বলল, নির্দেশ মতোই রিপোর্ট দেবে সে। না ভরদ্বাজ সায়েব এই বিষয়ে কোনো কথা সরাসরি বলেননি। ভদ্রলোক তো। আর সুবল সামান্য মানুষ। সে বুঝে নেবে ভরদ্বাজ সাহেব কেন ফোন করেছিলেন। ভরদ্বাজের কিছু না বলাও বলা, ভালো অফিসারকে তা বুঝে নিতে হবে।

হতাশ হয়ে গেলেন সন্দীপ ঘোষ। চুপ করে বসে থাকলেন। তাঁর একটা ভুল হয়েছিল। তিনি তা সংশোধনের কথা ভেবেছিলেন। যা দেখবে সুবল তাইই লিখবে রিপোর্টে। এখন আর উপায় নেই। ভরদ্বাজ সাহেবের উপরে তিনি নন। আর ভরদ্বাজ বলুন, না বলুন, তাঁকে অমান্য করার সাহস সুবল রায়ের হবে না। সে পিষ্ট হয়ে যাবে ভয়ের পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে। কিন্তু! ভরদ্বাজ সাহেব শেষ পর্যন্ত সুবল রায়কে ফোন করলেন! জেলা শাসককে করেননি। বিশ্বাস করতে পারেননি প্রোমোটি আই,এ,এস-কে ? প্রশাসনে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। সকলে নিজেকে নিরাপত্তার বলয়ে রেখে কাজ করে। সুবল এখনো সেই প্রশাসনের প্রশাসক হতে পারেনি হয় তো। সুবল কথাটা, মানে মিঃ ভরদ্বাজের ফোন করার কথাটা তাঁকে না বলতেই পারত। তাহলে তিনি সুবলকে সুপরার্মশ দিতে পারতেন। যাহ, ব্যাপারটা হাত থেকে বেরিয়ে গেল। তিনি আর সুবলকে ঠিকঠাক রিপোর্ট দিতে বলতে পারবেন না। তবুও কী মনে হতে তিনি মেসেজ করবেন ভাবলেন, কিন্তু লিখেও মুছে দিলেন, শতং বদ মা লিখ। ওই মেসেজই ভরদ্বাজকে প্রতিশোধস্পৃহ করে তুলবে তাঁর প্রতি। তখন ফোন এল অনিন্দ্য তালুকদারের, স্যার, ডিস্টারব করলাম, শুয়ে পড়েছেন ?

না, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পৌঁছে গেল প্রায়।

ডেপুটি কি এখন ফোন করেছিলেন?

নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন জেলা শাসক, বললেন, না তো।

পৌছে খবর দেননি?

না, বিডিও খবর দিল, কেন ?

কিছু না স্যার, আমিও পৌছে গেছি, ছোট একটা পাহাড়ের কোলে বাংলোটা, দারুন জায়গা, চাঁদের আলোয় সব ভেসে যাচ্ছে।

হ্যাঁ। অস্ফুট মন্তব্য করে তিনি বুঝতে পারলেন, একজন নিসর্গের কাছে পৌছল, আর একজন ক্ষতবিক্ষত লাশের সামনে। নিসর্গে চন্দ্রালোক, লাশের উপর চাঁদের আলো পড়েনি। ন'পাহাড়িতে আজ ঘোর অমাবস্যা। আচমকা তাঁর মনে হলো, ডেপুটি সুবল রায় যে তাঁকে ফোন করেছে তা জানে অনিন্দ্য। ফোনটা কে করেছিল সুবলকে, ভরদ্বাজ না তাঁর নামে এই চতুর যুবক ? সে কাউকেই বিশ্বাস করে না। নিজের নিরাপত্তা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। নিশ্চয় ফোনটা তার ছিল। নিজের শ্বশুরের নাম করে সে-ই ফোন করেছিল সুবল রায়কে। ইসস, ঘাড় হেট করে বসে থাকলেন জেলা শাসক।

দশ

কতসময় তিনি নিশ্চুপ বসে ছিলেন জানেন না। গায়ে হাত পড়লে ঘুরে তাকিয়ে দেখলেন বুবুন। মেয়ে জিজ্ঞেস করল, ঘুমোবে না ?

হুঁ, যাবো।

তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে বাবা, আসলে তুমি সিদ্ধান্তটা ভুল নিয়েছ মনে হয়।

তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন, মেয়ে খুব বড় হয়ে গেছে। কোন সিদ্ধান্তের কথা বলছে, আজ সন্ধের পর থেকে যা হয়ে গেল? না কি জেলা শাসকের ভার ? মেয়ে বলল, তুমি লোকটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছ বাবা।

ছেলেটা ভাল, ওদের পরিবারের অনেকে ভারতীয় প্রশাসনে আছে, ব্রিলিয়ান্ট।

তো মার্ডারের অধিকার জন্মে যায়?

তার ড্রাইভার মেরেছে।

বুবুন, সম্বিতা শান্ত গলায় বলল, তুমি লোকটার হয়ে কথা বলছ কেন , তাকে অ্যারেস্ট করা উচিত ছিল তোমার, ইসস, মেরে ফেলল পিটিয়ে?

সন্দীপ ঘোষ চুপ করে থাকেন। মেয়েকে বলছেন, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে, মেয়ে কানেই নিচ্ছে না। কলেজে পড়াবে। একটি গ্রুপের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তারা শহরের ফুটপাথবাসীদের জন্য স্কুল চালায়। মেয়ে বলল, তুমি এই ব্যাপারে ওই মার্ডারারকে কোনো হেল্প করবে না, লোকটা কী নিষ্ঠুর!

মেয়ে পায়চারী করছে। ও জানেই না প্রশাসনের ক্ষমতা কাদের ভিতরে নিহিত। ভরদ্বাজ, গুপ্তা, তালুকদারে না হলে আরো উপর থেকে অনুরোধ আসবে। স্বরাষ্ট্র সচিবও ফোন করতে পারেন। এম,এল,এ। এম,পি, থেকে মন্ত্রী, ক্ষমতার ঈশ্বরও খোঁজ নিতে পারেন। ক্ষমতা সকলের ভিতরে ভাগ করা। কোথাও তা টাল খেলে অন্য ক্ষমতাবানরাও অস্থিরতায় পড়েন কেন না ক্ষমতার একটা অনৈতিক দিক আছে। সেই দিকটি না থাকলে ক্ষমতা ক্ষমতা হয়ে ওঠে না। অনৈতিকতার ভিতরেই ক্ষমতা ভোগের আসল সুখ। আর

কোথাও সেই পথে কাঁটা পড়লে, সমস্ত ক্ষমতাবানের ভিতরে উদ্বেগ জাগে। ক্ষমতা ক্ষমতার স্বার্থ দেখে। বুবুন বলল, বাবা সব মিডিয়া তো তোমাকেই জিজ্ঞেস করবে।

তদন্ত চলছে, আইন আইনের পথেই চলবে। বিড়বিড়িয়ে বললেন সন্দীপ ঘোষ। শুনে মেয়ে বলল, বাবা, তুমি কলকাতায় ফিরে চল, ডি,এম, হতে হবে না আর।

তিনি হেসে ফেললেন। মেয়ে বলল, ওই ওসিকে বাঁচানো উচিত তোমার, মনে হচ্ছে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে তুমি ভুল রির্পোট দিতে বলেছ।

সে কি বাচ্চা ছেলে, রির্পোট তার নামে জমা পড়বে, কিন্তু তুই এসব বলছিস কেন, তুই জানলি কী করে আমি তাকে কী বলেছি?

তোমার ফোনের কথা শুনে সবটাই বোঝা যায়, ডেপুটি তোমার ঠিক করে দেওয়া রির্পোট দেবে, বাবা আমি কি ঠিক বলছি, তুমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছ কী লিখতে হবে, কী ভাবে লিখতে হবে, আমি হয়তো সবটা জানি না, কিন্তু বুঝতে পারছি সন্ধে থেকে কিছু একটা ঘটছে, আর তুমি তার জন্য টেনসড হয়ে আছো।

আমার কিছু না, কিন্তু আমি তো জেলার দায়িত্বে।

আমি জানি আমার বাবার কিছু না, বাবা তুমি ওই ঠান্ডা মাথায় পিটিয়ে মারার কথা বললে কেন উপরে এসে, তারপর থেকে আমিও টেনসড।

আমি তো যা ঘটছে তা বলি তোর মাকে।

অফিস ছাড়া তোমার আর বলার কিছু নেই?

চুপ করে থাকলেন সন্দীপ ঘোষ। সত্যিই তো, গত কুড়ি বছর অফিস আর জীবন এক হয়ে গেছে। এর বাইরে যে মহাপৃথিবী তার কোনো খোঁজ রাখেন না তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, শেষ কোন নাটক দেখলি তুই ?

দেবব্রত বিশ্বাসের জীবন নিয়ে একটা নাটক, রুদ্ধ সঙ্গীত।

তুই দেবব্রত বিশ্বাসের গান শুনিস ?

ইয়েস বাবা, একটা বই আছে তাঁর, ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত, নিজেরই আত্মকথা, তাঁর গান বন্ধ করে দিয়েছিল বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড ।

আমি কলকাতায় গিয়ে দেখব। কত নিশ্চিন্তে তিনি বললেন কথাটা।

বাবা, কিন্তু ওই ওসির কী হবে, সে তো কিছু করেনি ?

সন্দীপ ঘোষের মনে হলো বুবুন-সম্বিতা তাকে জেরা করছে। সে সবটা বুঝে নিয়েছে। কী করে বুঝল ? বুবুন কি কোনো মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে তাঁদের অজানতে ? ওই সব সংগঠন খুব বিব্রত করে। এই যে লোকটা মারা গেছে, ভরত কুইলা, সেও তো মানবাধিকার চাইছিল খাদানের চাপা পড়ে যাওয়া ক'জন মানুষের জন্য। তাঁর মনে হলো বুবুনকে এই আলোচনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা দরকার, তিনি বললেন, তার কাস্টোডিতে ঘটনা ঘটেছে, আটকানো উচিত ছিল।

তুমিই তো আটকাতে পারছ না ওই ব্রিলিয়ান্ট আই,পি,এস কে, ওসি কী করে আটকাবেন, সিম্পল একটা থানার দারোগা ?

দারোগা! শব্দটি অনেকদিন বাদে শুনলেন তিনি। মেয়ে পাকা উকিলের মতো কথা বলছে। ও কি এই ঘটনার কথা আর কাউকে বলেছে ? কথাগুলো কি ওর না অন্য কারোর?

তিনি ধীরে ধীরে বললেন, তুই বুঝবি না বুবুন, লোকটাকে তো জেরা করতে তুলে এনেছিল ওসি, সেখানে তখন ডি,এস,পি, হাজির...। সন্দীপ বুঝতে পারছিলেন কাহিনি তিনি তাঁর মতো করে সাজিয়ে দিচ্ছেন। এখনই বদলে দিয়ে বুবুনের মতামতকে প্রভাবিত করতে হবে। ওসি, ওসি, ওসি। তিনি অনিন্দ্যর পক্ষ নেওয়া ব্যতীত অন্য কিছু ভাবতে পারছেন না। এটি তাঁর চাকরির সমস্ত জীবনের অভ্যাস। ক্ষমতার অভ্যাস। ক্ষমতা ক্ষমতার পাশেই থাকে। মেয়ে তা জানে না। তিনি বললেন, ঘটনা কী হয়েছে ওসিকে জেরা করেই বোঝা যাবে, ‘অনিন্দ্য তো ঝিলিমিলি উইথ হিজ ওয়াইফ। ওদের বাচ্চাটি দুন স্কুলে পড়ে। ও বলছে যায়নি ন’পাহাড়ি।

তাহলে কী বলে গেল এসে ?

ঘটনা ঘটেছে, ও ঝিলিমিলি থেকে ছুটে এসেছিল শুনে।

সম্বিতা চুপ করে থাকে। তার চোখমুখে বিস্ময়। মিথ্যে। বাবা তার কথা বদলে নিচ্ছে আস্তে আস্তে। বাবা কেন বদলে নেবে, কী স্বার্থ বাবার ? তাহলে ও খুব ব্রিলিয়ান্ট, ওর ফ্যামিলি খুব অভিজাত, ওর ভিতরে নীল রক্ত এই সব কথা উঠল কেন? ওসিকে বাঁচাতে বাবা কি ডেপুটিকে বলছিল, কী লিখতে হবে, কী ভাবে লিখতে হবে ? বাবা তার বয়ান বদলে ফেলছে। ইস, তার বাবা। লোকটার বাচ্চা দুন স্কুলে পড়ে তো হলো কী ? সে আর কথাই বলবে না এই নিয়ে। কিন্তু ফিরেও যাবে না কলকাতায়। সবটা সে দেখতে চায়। গুড নাইট বাবা, বুবুন তার ঘরে চলে যায় আচমকা। জেলা শাসক টের পেলেন ক্ষমতা তাঁকে তাঁর কন্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। ক্ষমতার র্ধম এই। সে কোনো বিরুদ্ধতা পছন্দ করে না। তিনি ঘরে চলে গেলেন। ব্যালকনির আলো জ্বলতে থাকল। শূন্য চেয়ার হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ব্যপ্ত অন্ধকারের দিকে। সেই অন্ধকার পার করে সুবল রায় পৌঁছেছেন ন’পাহাড়ি। হাইওয়ে থেকে ডানদিকে ঘোরার মুখে থানার জিপ দাঁড়িয়ে ছিল। জ্যোৎস্না ছিল। ডেপুটি ডেপুটি তা দেখতে পেলেন না। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আসছেন তদন্তে, খবর এসে গিয়েছিল। এস,আই, সুধন্য মাইতি অপেক্ষা করছিল। ওসি থানায় বসে আছেন। সুবল রায় সেই পাহাড়গোড়ায় নেমেছেন, আপনি ?

আমি এস,আই, মাইতি, সুধন্য মাইতি স্যার, ওয়েটিং ফর ইউ স্যার।

সুবল রায় বড়জোর পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চি, কিন্তু তাঁর মুখখানি গম্ভীর। গাম্ভীয তাঁকে উচ্চতা দেয়, ডেপুটির উচ্চতা। সেই উচ্চতা থেকেই কথা বলছেন, জিজ্ঞেস করলেন, ওসি, ন'পাহাড়ি কোথায় ?

থানায় আছেন স্যার।

ওসির আসা উচিত ছিল। সুবল রায় ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, থানায় কেন, ব্লক হসপিটালে আসতে বলুন।

ইয়েস স্যার।

আপনি আমাকে ব্রিফ করুন, আগে সবটা জেনে নিই, ওসি এলে ঠিক হতো।

ডাকব স্যার।

না, আমি পরে শুনে নেব। বললেন সুবল রায়। আর তখনই তাঁর ফোন বাজল। তিনি পকেট থেকে বের করে দেখলেন মিনিট চল্লিশ আগে সেভ করা সেই নাম্বার। ভরদ্বাজ সাহেব। স্যার, সুবল রায় বলছি, তিনি ফোন ধরতেই কেটে গেল। একটু দেরি হয়েছে। সাহেব আবার ফোন করলেন। ডেপুটি ধরলেন না। তিনি রিং ব্যাক করলেন একটু সরে গিয়ে। ফোন বাজল না। নট রিচেবল। ভরদ্বাজ যখন নিজে যোগাযোগ করেছিলেন, তখন সুবল ধরতে পারেননি, এখন তিনি অধরা। অনেক অনেক উপরের মানুষ। ডেপুটির ঈশ্বর।

সুধন্য সমস্তটা নিজের মতো করে বিবৃত করে। সে গিয়েছিল লোকটাকে তুলতে। তারপর জানে না। ছিল না থানায়। অন্য একটি তদন্তে বেরিয়েছিল। ডেপুটি সুধন্যর বয়ান লিখবেন ব্লক হাসপাতালে গিয়ে। তাঁরা ব্লক হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছলেন। ডেপুটি দেখতে পেলেন না হাসপাতালের প্রান্তে গাছতলার অন্ধকারে এবং খালি জমিতে বেশ কয়েকজন বসে। রাঙামাটি গ্রামের আরো কয়েকজন। ডেপুটি ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলেন লাশ ঢাকা রয়েছে শাদা কাপড়ে। ব্লক মেডিকাল অফিসার বললেন, ব্রট ডেড, স্যার ভিডিও করেছি আমি।

আচ্ছা। ডেপুটি বললেন, ভিডিওগ্রাফার আছে এখানে ?

ইয়েস স্যার, এখন কোর্টের ডাইরেকশন আছে যে কোনো অস্বাভাবিক মৃত্যুর ভিডিও করতে হবে।

জানি। ডেপুটি সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে ভরত কুইলাকে দেখলেন। দেখে চমকে উঠেছেন। ক্ষত-বিক্ষত দেহ উদোম দেহ। উদোম করেছে ভিডিওগ্রাফার। তাকে ডাকা যাবে। সে সদরে ফিরে গেছে স্যার। সদরের ভিডিওগ্রাফার এসেছিল ? ইয়েস স্যার। কাছাকাছি ছিল একটা বিয়ে বাড়িতে। ডেপুটি চোখ সরিয়ে নিয়ে নিশ্চুপ। এভাবে মারে ? পোকা-মাকড়ের মৃত্যু। চোখ মুখ থেঁতলে গেছে। লাথি মেরে পেট ফাটিয়ে দিয়েছে। নাড়িভুড়ি বেরিয়ে এসেছে। অসংখ্য ইনজুরি সামনে আর পিছনে। তিনি যা দেখার দেখে বাইরে অপেক্ষমাণ এস,

আইয়ের মুখোমুখি হলেন। মাথা নুইয়ে হাত জোড় করে পরিচয় দিল এস, আই সুধন্য মাইতি। ডেপুটি জিজ্ঞেস করলেন, ওসি কোথায় ?
থানায় স্যার, আপসেট হয়ে গেছেন, মারা যাবে যে ভাবেননি উনি।
ডেপুটি বললেন, থানায় যাবেন। ওসির কাছে রির্পোট নেবেন। কী রির্পোট নেবেন তিনি? সবই তো টের পাচ্ছেন তিনি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হনহন করে হাঁটলেন নিজের গাড়ির দিকে, মাইতি তাঁর পিছনে প্রায় ছুটতে লাগল। ভগবান যেন কোনো কথা না বলে। ভগবান র্বমণ কিছু বলতে চাইছিল। ডেপুটি গাড়িতে উঠে গেলে মাইতি তাঁকে অনুসরণ করল থানার গাড়িতে। ভগবানও সেই জিপের পেছনে উঠে বসল। ব্লক মেডিকাল অফিসার এবার এই দেহ সদরে পাঠাবেন পোস্ট মরটেমের জন্য। একটা কেস হবে। পুলিস কাস্টোডিতে মৃত্যু। ডেপুটিকে যেতে হবে কোর্টে। সাক্ষ্য দিতে হবে। এই সব মামলা চলে র্দীঘদিন ধরে। অন্য জেলায় গেলেও সাক্ষ্যের জন্য আসতে হবে এই জেলায়। থানায় পৌঁছে তিনি দেখলেন মৃদু আলোর নিচে টেবিলে মাথা রেখে একটা লোক বসে আছে। সুধন্য ডাক দিল, স্যার, ডেপুটি সায়েব এসেছেন, স্যার। ওসি ধীরে ধীরে মাথা তুললেন। অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টি। ডেপুটি ওসিকে বললেন, বডি তো পোস্ট মরটেমে যাবে, আপনার কয়েকজন আরম র্গাড পাঠান, একজন অফিসার, এস,আই, মনে হলো গ্রামের লোক আছে ওখানে, ওরা খবর পায়নি ডেথের, পেলে তো ঝামেলা হতে পারে।
ওসি বললেন, মাইতি তুমি যাও।
সুধন্য মাইতি বলল, আমি কেন স্যার ?
তাহলে কে যাবে, তুমিই তো তুলেছ। গোলকবিহারী ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন।
সুধন্য বলল, নো স্যার, আপনি আদেশ করলে তুলেছি, আপনি গাড়িতে ছিলেন।
তখন এ,এস,আই, ভগবান র্বমণ বলল, থাকুন না, ওসি বলছেন তো, র্অডার তো এটাও, আর ডেপুটি সাহেব যদি এইসব কথা রিপোর্টে লেখেন...।
মাইতি শেষ অবধি গেল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে না করতে পারল না। ভগবান যে কথাটা বলল, এই সব কথাও রিপোর্টে যদি থেকে যায়! ডেপুটি ডাকলেন ওসিকে থানার বাইরে। খা খা শুন্য সেই আকাশতল। শুধু চারিদিকে চাঁদের আলো। ডেপুটি তাঁর সামনের নিস্তব্ধ মানুষ, ওসি ন'পাহাড়িকে জিজ্ঞেস করলেন, এভাবে মারলেন, কী হয়েছিল বলুন তো?
আপনি শুনবেন স্যার ?
ইয়েস, সবটা জেনেই রির্পোট লিখব। বললেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুবল রায়।

এগার

অনেক রাত্রে ডেপুটি ফিরেছিলেন। ফিরতে ফিরতে ওসির সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ভুলে গিয়েছিলেন। পরদিন দুপুরে জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। রির্পোট দিয়েছিলেন। দুটি মাত্র ক্ষত তিনি দেখেছেন। মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত।

কিন্তু আসলে কতগুলো ইনজুরি হবে সুবল ?

ডেপুটি বললেন, অনেক স্যার, দেখা যায় না চোখে।

ওসি কী বলল?

ডিএসপির ড্রাইভার পল্টন না কে মেরেছে, কিন্তু তার কোনো প্রমাণ নেই।

রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে নিলেন জেলা শাসক, না, ডি,এস,পির কথা নেই রিপোর্টে। থাকবে কেন? শুধু লাশ পযবেক্ষণের রির্পোটই তো দেওয়ার কথা ম্যাজিস্ট্রেটের। তাইই দিয়েছে। মামলা হবে। সেখানে এই রির্পোট খুব মূল্যবান। ডি,এস,পি যতই না যাওয়ার কথা বলুক, তার নাম উঠে গেছে এর ভিতরেই। এই রির্পোটই অনিন্দ্যকে বাঁচাবে।

ওয়েল ডান। জেলা শাসক বললেন, ইউ উইল গেট আ রিওর্য়াড।

স্যার।

তিনি বললেন, তুমি যাও, কিছুই কাউকে বলতে হবে না, ইনকোয়েস্টের কথাও না।

ইয়েস স্যার।

ওসি কিছু বলল ? জেলা শাসক জিজ্ঞেস করেছিলেন।

লোকটা খুব অ্যাডাম্যান্ট স্যার, বলছে ডিয়েসপি মেরেছে।

ওক্কে, তোমাকে এসব কথা বলতে হবে না।

তখন ন'পাহাড়ি থানা থেকে ওসি গোলকবিহারী তার গাড়িতে রওনা হবেন এস,পি-র অফিসে। এস,পি, ফোন করে তাকে ডেকেছে মেইলে তার ছুটির দরখাস্ত পেয়ে। মেইলে ছুটির দরখাস্ত দেওয়া যায় না। গোলক দিয়েছে ভগবান র্বমণের কথায়। জানিয়ে দেওয়া তো হলো। ওসি গোলকবিহারী সমস্ত রাত ঘুমোয়নি। তার সঙ্গে জেগেছিল আধ-বুড়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনসপেকটার র্বমণ। পঞ্চাশেই তার বেশিরভাগ চুল শাদা, ডান চোখের ছানি কাটিয়েছে এই শীতেই। সে এই জীবনে দেখেছে অনেক। ডেপুটির সঙ্গে ওসির কথা কাটাকাটিতে সে ছিল চেম্বারের বাইরে, কিন্তু শুনেছে সব। ডেপুটি বলছিলেন, ডি,এস,পি তো ঝিলিমিলিতে, আসতেই ঘন্টা চার লাগবে, আর আই,পি,এস-অফিসারের নামে এভাবে দোষ চাপানো যায় নাকি, আপনি তো চাকরি করবেন এর পরেও !

স্যার, আটকাতে গেছিলাম, উনি না করেছেন, উনিই সব করেছেন টাচ না করেও। ডেপুটি চলে গেলে র্বমণ বলেছিল, আপনি ফেঁসে যাচ্ছেন স্যার, সবাই আপনাকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে, আপনি এখন কী করবেন, ইস, সুধন্য এস,আই আর ডিয়েসপি মিলে আপনাকে বিপদে ফেলে দিল, কেন গেলেন আপনি তুলতে?

কী করব এখন র্বমণ, আমি পুলিস সার্ভিসে এসে কখনো কাউকে একটা চড়ও মারিনি, কিন্তু আটকাতেও পারলাম না ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট।

জানি স্যার, আমি আপনাকে চিনি, আপনি কী করবেন, ডি,এস,পি-- আই,পি,এস দেখলে আমার ভয় করে।

এখন কী করি ?

র্বমণ বলেছিল, পল্টন এর আগে একবার মানুষ মেরেছিল স্যার, আমি জানি, প্রমাণ হয়নি তাই, আপনি ছুটিতে যান।

এসব রাতের কথা। র্বমণকে অবলম্বন করেছিলেন গোলকবিহারী। পরদিন র্বমণকে নিয়েই রওনা হয়েছিলেন সদরে বড় র্কতার অফিসের দিকে, কী হয়েছিল সেই রির্পোট তিনি লিখেছেন। এস,পি, কে দেবেন আর মুখেও বলবেন। গাড়ি কিছুটা এগোতে ড্রাইভার কানু জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় যাবেন স্যার ?

কেন, এস,পি-র অফিসে।

কানু তখন র্বমণকে বলেছিল, আপনারা কিছু বুঝতে পারছেন না র্বমণ স্যার ?

কী ?

এস,পি-র অফিসে গেলে উনি যদি অ্যারেস্ট হয়ে যান ?

কেন ? গোলক আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করেছেন।

আপনার হেফাজতে মৃত্যু, স্যার আপনাকে র্দুগাপুর স্টেশনে দিয়ে আসি, আপনি বাড়ি চলে যান, এখনো রাঙামাটির লোক জানে না ঠিক কী হয়েছে, ওরা থানায় আসবে।

তাদের ফেস করতে হবে, তারা বুঝবে।

কেউ বুঝবে না স্যার, আপনার বিরুদ্ধেই সব হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি, আপনি পারছেন না, খাদান মালিকরা এক জোট হয়েছে, আপনার বিরুদ্ধে পাবলিক লেলিয়ে দেবে।

গোলকবিহারী বললেন, এস,পি,কে কিছুই জানাবো না ?

এস,পি কি জানেন না, সবই জানেন, আপনার ঘাড়ে দোষ চাপানো সহজ, আপনার হেফাজতে মরেছে স্যার, আপনার তো দায়িত্ব ছিল বাঁচিয়ে রাখা।

হ্যাঁ, দায়িত্ব ছিল গোলকবিহারীর। তাকে নিয়ে এসেছিল, বাঁচিয়ে রাখবে না ? শেষ পর্যন্ত তাকে পালাতে হয়েছিল। না, পালালে সে গ্রেপ্তার হয়ে যেত। র্দুগাপুর স্টেশনে নিয়ে গিয়ে র্বমণ আর কানু ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছিল। র্বমণ বলেছিল, দেখুন স্যার, দরকারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।

কী হবে বলো দেখি র্বমণ।

স্যার, একটা ব্যাপার হয় এক্ষেত্রে, আপনাকে গ্রেপ্তারের খুব চেষ্টাও করবে না পুলিস ডির্পাটমেন্ট, আপনি অ্যাবসকন্ড করে থাকুন, দেখি পরিস্থিতি কী হয়, জানাব, নতুন একটা সিম নেবেন আজই গিয়ে, এই ফোন অফ করে দেবেন।

কানু বলল, তালুকদার সায়েবকে বাঁচাতে আপনাকে বলি দেবে, আপনি ভাল থাকুন স্যার, আমরা আপনার বিপক্ষে যাব না।

র্বমণ বলেছিল, আজই একবার হাই কোর্টে গিয়ে উকিলের সঙ্গে কথা বলে নিন, আগাম জামিন যদি পাওয়া যায়, কেস তো হবেই।

ট্রেন চলল। বিদায় ন'পাহাড়ি। ও উড়িয়া যাও রে---ওরে...। দুপুরের শেষে ট্রেন হাওড়ায়। গঙ্গা পেরিয়ে তিনি বাবুঘাট হয়ে হাই কোর্ট এলাকায়। তখনও গমগম করছে কোর্ট। যত মানুষ রাস্তায়, ততো মানুষ আদালতের ভিতরে। বহু পুরোন মামলা-মোকদ্দমার শুনানি হয়েই চলেছে। সকলেই ব্যস্ত প্রায়। তিনি ক্রিমিনাল ল-ইয়ার শোভন বসুর চেম্বারে উঁকি দিয়েছেন। মিঃ বসু দিল্লি গেছেন, সুপ্রিম কোর্টে মামলা তদ্বির করতে। আরো চেনা ল-ইয়ার আছে, যাবেন কি? গোলক অবসন্ন বোধ করছিলেন। পথেই দেখা হলো বিজন মজুমদারের সঙ্গে। উত্তরবঙ্গের কোনো এক জেলার লক্ষ্মীপুর থানার ওসি। তাঁর সঙ্গেই ট্রেনিঙে ছিল। তাঁকে জড়িয়ে ধরল, কেমন আছিস গোলকভাই।

বিজন মালদহের পাশের জেলা উত্তর দিনাজপুরের ছেলে। ট্রেনিঙের পর প্রথম পোস্টিং ওদিকেই বাগিয়েছিল মন্ত্রী ধরে। জেলার লোকের সঙ্গে মন্ত্রী,এম,এল,এ-র সরাসরি যোগাযোগ থাকে। কলকাতা বা কলকাতা শহরতলীর লোকের অত থাকে না। আর গোলকবিহারীর তো ছিল না। ফলে তাকে ঘুরতে হচ্ছে দূরাঞ্চলে। প্রথম পোস্টিং ছিল রায়গঞ্জ থানায়। বিজন ছিল পাশের জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডীতে। বিজন বলল, চ, কোথাও বসি।

অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

কোন অ্যাডভোকেট ?

নাম বলতে বিজন বলে, দিল্লি, আমিও কাল দেখা করব, রাতের ফ্লাইটে ফিরবেন মিঃ বসু, এখন গিয়ে লাভ নেই।

গোলকবিহারী বুঝতে পারছিলেন, তাঁর মাথা কাজ করছে না। শোভন বসু কেন, তাঁর তো বলার কথা অন্য অ্যাডভোকেট ঋত্বিক পাত্র কিংবা শময়িতা ঘোষের নাম। কিন্তু তাদেরই বা কী কথা বলবেন, সমস্ত ঘটনা? আগাম জামিন? কথা বিশ্বাস করবে তো অ্যাডভোকেট? নাকি মনে মনে বলবে খুন করে এসে জামিন খুঁজছে। বিজনকে বলা যায় কি? ওর তো মন্ত্রী,এম,পি, জানা। মধুর সর্ম্পক নিশ্চয়। বিজনের সঙ্গে র্ধমতলা অবধি হেঁটেছিলেন গোলক। তাঁর মনে হচ্ছিল বলেন, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সাহায্য করবে কি? আর ঘটনা কোন দিকে যায় তা তো জানেন না তিনি, দেখা যাক কী খবর আসে। তবু বিজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তার এস,পি, কেমন?

বিজন বলল, নমস্কারি দিলেই হলো মাসে মাসে, ওতেই ভাল, হরিয়ানার লোক, জাঠ।

থানায় তোর কাস্টোডিতে মরেছে কখনো ?

চমকে ওঠে বিজন, তুই জানলি কী করে ?

তার মানে ?

সেই কেসেই ঘুরছি, তবে মিটে যাচ্ছে।

কী করে মিটছে ?

ভয় দেখিয়ে।

তার মানে? গোলকবিহারী অবাক হয়ে গর্ভনর হাউসের বাইরের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বিজনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বিজন জিজ্ঞেস করল, তুই কি ফেঁসেছিস নাকি ?

না, কিন্তু ভয় দেখিয়ে কী করে?

শুনবি তুই গোলক, তুই এই সার্ভিসে এলি কেন, বলেছি একটা ছেলে মরেছে, পরেরটা যদি মরে রোড অ্যাকসিডেন্টে, তখন, বাড়ির যুবতি বউ যদি ডাকাতিতে রেপড হয়ে যায়, তখন ?

মালোদের ছেলে। দুবলা ছিল। ধোলাই বেশি হয়ে গিয়েছিল। মরে যেতে ম্যাজিস্ট্রেট রির্পোট, এস,পি-র রির্পোট সব ওসির ফেভারে ছিল, পোস্ট মরটেম রিপোরট শুধু বিপক্ষে গিয়েছিল। শালা মর্গের ডাক্তার। কথা শোনেনি। আর মানবাধিকার পারটি ছেলেটার বাবাকে তাতায়, কেস চলছিল। এতদিন বাদে ভয় দেখাতে বুড়ো কেস তুলে নিচ্ছে। মানবাধিকার পারটি পারল না। বিজন কিছু দিয়েছে বুড়োকে। কত ? লাখ দুই। দু'লাখ, দিতে পারল বিজন? কত আর মাইনে পায়। কী করে দিল?

বিজন বলেছিল, তোর থানায় কত ওঠে?

এস,আই, তোলে।

তা তুলুক, কত বল না। বিজন জিজ্ঞেস করেছিল।

মাথা নেড়েছিলেন গোলক। জানেন না। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন টাকার পরিমাণ কত হলে একটা মানুষকে মেরে ফেলে পথের কাঁটা সরিয়ে দেওয়া যায়।আবার জনক জননীর মৃত্যু শোক নিবারণও করা যায়। বিজন বলেছিল, কোর্টে যে বহুদিন মামলা চলে, এতে সুবিধে হয়, দম ফুরিয়ে যায় পাবলিকের। তখন কেস তুলতে চাপ দাও, ভয় দেখাও। আবার টাকার লোভ দেখাও। হয়ে যায় ফয়সালা। শুনতে শুনতে গোলকের মনে হয়েছিল, বলে ফেলেন। বিজন খুব পাটোয়ারি ছেলে। বিজন কি তাকে বুঝবে না ? কিন্তু ঘটনা কোন দিকে যায় তা তো দেখতে হবে। বিজনকে বলা মানে এক এক করে পুলিস বিভাগেই কথাটা রটে যাবে। বিজন নিজে যে মেরেছিল থানা হাজতে, তা কি কেউ জেনেছে? জানলেও পরে তা ভুলে গেছে। গোলক কিছুই বলেননি বিজনকে। আর তার মনে হয়েছিল বিজন কিছুতেই ডি,এস,পি, সাহেবের দোষ দেখবে না। গাড়ির ড্রাইভার পেটাচ্ছে, গোলক কেন তার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেয়নি ? ডি,এস,পি, কী" করল ? তিনি দেখছিলেন র্ধমতলায় বাড়ি ফেরা মানুষের ভীড়। তিনি নিজে সকলের থেকে আলাদা। বিজন চলে

যেতে তিনি একা গড়ের মাঠে গিয়ে বসেছিলেন। অন্ধকার নেমে আসা দেখেছিলেন। একবার ফোন খুলে র্বমণকে ধরেছিলেন, র্বমণ বলল, ফোন বন্ধই রাখুন স্যার, নতুন সিম নিন কালই, দুপুরে এস,পি, থানায় এসেছিলেন, তাঁকে খুঁজছিলেন। নেই দেখে, মাইতি স্যারের হাতে থানার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন।

রাঙামাটির কেউ এসেছিল?

ওরা জেনে গেছে, মর্গে রয়েছে বডি নিতে, ওক্কে স্যার, মাইতি আসছে এদিকে।

গোলকবিহারীর মনে পড়ল ন'পাহাড়ির কথা। কী সুন্দর জায়গা। বউ আর মেয়ে গিয়েছিল শীতের সময়, দুমাস আগে। গোলকের হঠাৎ কান্না এল চোখে। মাথা নামিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে একা একা। মাথার উপরে অন্ধকার আকাশ। দূরে আলোকিত মহানগরীর ঝলমলে সন্ধ্যা। শুধু এই অন্ধকার যেন তাঁর পরম আশ্রয়। তিনি কাঁদতে লাগলেন।

বারো

খালি হাতেই গোলকবিহারী বাড়ি পৌঁছেছিলেন অনেক রাতে। বাগুইয়াটির ঘিঞ্জি ফ্ল্যাটের জঙ্গলে তাঁর ফ্ল্যাট। বিক্রি করার কথা হচ্ছে। নতুন একটি ফ্ল্যাট বুক করেছে তাঁর স্ত্রী রনিতা। কমপ্লিট হতে আরো ছমাস। না বলে অত রাতে তাঁকে দরজায় দেখে রণিতা অবাক, হঠাৎ চলে এলে যে ?

গোলক ভিতরে ঢুকে বললেন, জল দাও।

সকালে স্নান করে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রেন জার্নি আর শহরে নেমে অনেক ঘোরাঘুরি তাঁকে ক্লান্ত করেছে। মেয়ের বয়স সাত। ক্লাস টু। এখনো কত বছর লাগবে বড় হতে, লেখাপড়া শেষ করতে, মেয়েকে জড়িয়ে গোলক বললেন, কদিন ছুটি নিয়ে এসেছি।

অনেকদিন ছুটি ? টিয়া তাকে আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ সোনা, অনেকদিন ছুটি।

সানডেতে আমরা ইকো পার্ক যাব বাবা।

গোলক বললেন, যাব।

সোনা বাবা আমার। মেয়ে তাঁকে চুমু দিল।

তখন রণিতা জিজ্ঞেস করল, তুমি খুব ক্লান্ত ?

হু, সকালে বেরিয়েছি।

রণিতা বলল, স্নান করো গরম জলে, ফ্রেশ হও।

গোলক কিছু না বলে স্নান করলেন। বাড়ির পরিষ্কার পায়জামা পাঞ্জাবি পরে পেটপুরে খেলেন। মেয়ে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। গোলক ব্যালকনিতে গিয়ে সিগারেট ধরালেন। সামনে অন্ধকার ইটের জঙ্গল। জানলাগুলিতে আলোর বিন্দু। ন'পাহাড়ির কথা মনে পড়ছিল তাঁর।

এমনও ভেবেছিলেন কাঠা চারেক জমি কিনে পাহাড়তলীতে একটা বাংলো বাড়ি করে ন'পাহাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দেবেন সমস্ত জীবন। হবে কি তা ? রণিতা এসে বসেছে সামনের চেয়ারে। শাড়ি বদলেছে, মুখের প্রসাধন শেষ করেছে। রণিতা জিজ্ঞেস করল, আচমকা চলে এলে যে ?

এমনি, ইচ্ছে হলো।

ব্যাগ নেই, খালি হাতে চলে এলে ছুটি নিয়ে ?

গোলক মিথ্যে বললেন, ব্যাগ ছিল, খোয়া গেছে ট্রেন থেকে।

রণিতার চোখে যে সন্দেহ তা অন্ধকারেও বুঝতে পারছিলেন গোলক। তিনি চুপ করে থাকলেন। রণিতা একটু পরে বলল, তোমাকে তো কাল ফোন করলাম, ব্যস্ততায় কেটে দিলে, আজ তা নেই, চলে এলে ?

তাহলে কাল ভোরে চলে যাই। গোলক ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, ইচ্ছে হলো চলে এলাম, ভালো লাগছিল না, চলে এলাম।

আহা আমি কি তাই বলেছি! রণিতা তাঁর দিকে এগিয়ে এল চেয়ার টেনে, তাঁর মাথায় হাত দিল, অনেক চুলে আঙুল সরাতে সরাতে বলল, এসেছ ভালো করেছ, মেয়েটা কদিন ধরে বাবা বাবা করছিল, ব্যাগে কী ছিল?

শারট, প্যান্ট আর পাঞ্জাবি, বই, কিছু অফিসের কাগজ। গোলক বানিয়ে বললেন।

রণিতা বলল, কখন বেরিয়েছো ?

তুমি কি আমাকে জেরা করছ ?

রণিতা ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে তাঁর গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, আজ শেভ করনি কেন?

গোলক ভাবছিলেন, কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাক বরং রণিতার কাছে। বলবেন কি? শেভ করার কথা আজ মনেই হয়নি সকালে। কী ভয়ানক রাত গেছে প্রায় নির্ঘুম। ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রণিতা তাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ওর কাছে সব খুলে বলা ভালো। কিন্তু, না। খবর এলে বলবেন। হয়তো তেমন কিছুই হবে না। থানা হাজতে মৃত্যু তো হয়েই থাকে। প্রায়ই খবর থাকে। তারপর কী হয়েছে জানা যায় না। সোরগোল উঠে থেমে যায়। পরের খবরে আগের খবর চাপা পড়ে যায়। আজ থাক। ভর্যাত হয়ে রাত কাটাবে রণিতা। একটা সন্দেহের বীজ ওর ভিতরে ঢুকেছে। রণিতা বলল, চলো, আর বসে থেক না, ঘুম পাচ্ছে, সকালে মেয়ের স্কুল।

গোলক আর না করলেন না। সমস্তদিন কেন গত সন্ধ্যা থেকেই একটা গ্রেপ্তার, হত্যা, নিষ্ঠুরতার ভিতরে ডুবে আছেন তিনি। গায়ে যেন লেগে আছে ছিটকে আসা রক্ত, ঘিলু, চোখের জল। তা গা থেকে ধুয়ে ফেলার দরকার। গোলক বিছানায় ঢুকে রণিতাকে আশ্রয়

করে চুপ করে তার শরীরের ওম নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়ছিলেন যখন, তাঁকে জাগিয়ে দিল রণিতা, জিজ্ঞেস করল, তোমার কী হয়েছে বলবে আমাকে।

কিছু হয়নি তো। গোলকের গলায় অস্ফুট বাক্য।

খালি হাতে চলে এলে?

ব্যাগ হারিয়ে গেল যে ট্রেনে।

না, হারায়নি ব্যাগ। রণিতা বলল।

তিনি বললেন, আমাকে ঘুমোতে দাও।

না, দুমাস বাদে বাড়ি এলে, এখন ঘুমোবে না।

সকালে টিয়ার স্কুল।

রণিতা বলল, ও স্কুল যাবে না, বাবাকে নিয়ে থাকবে না হয় একদিন।

চুপ করে গোলক রণিতার শরীর থেকে সরে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু তা টের পেয়ে রণিতা তাকে আশ্লেষে আঁকড়ে ধরল। বলল, কী হয়েছে তোমার বলবে না গো।

গোলক ভেঙে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন, বললেন, ডিয়েসপির সঙ্গে গোলমাল।

তাই বলো, কী গোলমাল ?

খুব অশান্তি, আমি সাসপেন্ড হয়ে যেতে পারি।

সেই ব্লু ব্লাড অ্যারিস্টোক্র্যাট ! রাফ লোকটা, সাসপেন্ড হলেই হলো, কোর্টে যাবে, অত ভয় পেলে হয়, এস আমার কাছে এস, আরো, ও গোলক।

সাড়া দিতেই হলো। সাড়া দিতেই মাথার ভিতর থেকে সেই নীল রক্তের মানুষ, রক্ত, ঘিলু মাখা একটা মানুষ...উধাও। অনেকদিন পরে স্বামী স্ত্রী সংলগ্ন হলো। রণিতা বিড়বিড় করল, ভয় পাও কেন ?

আমার খুব খারাপ লাগে, হি ইজ লাইক আ নটরিয়াস ফিউডাল র্লড।

থাক, ইউ আর মাই বিলাভড র্লড গোলক, ভালবাস আমাকে।

ভালবাসা দরকার ছিল। ন'পাহাড়িতে সে ভালো নেই তা নিজের ভিতর থেকে টের পাচ্ছিল। ন'পাহাড়িতে সে প্রায় একা। অধস্তন র্কমচারী, এ,এস,আই র্বমণ, কনস্টবল কিংবা গাড়ির ড্রাইভারের গোপন সর্মথন বাদে, এস,পি, ডি,এস,পি, থানার এস,আই... তাঁর পক্ষে কেউ কথা বলে না। আড়ালে হাসাহাসি করেন। সব তিনি জানেন। সকলে মিলে তার গায়ে এক নিরপরাধের রক্ত ছিটিয়ে দিল। বলবেন রণিতাকে। গোলক বুঝতে পারছিলেন বলা দরকার, কিন্তু ভয় করল, বিশ্বাস করবে তো ? তাঁর দায়িত্ব তিনি পালন করেননি। লাঠি কেড়ে নিতে পারতেন। তারপর যা হয় হতো। রণিতা গলে যাচ্ছিল ভালোবাসায়। তাঁর মনে হচ্ছিল বলেন, কিন্তু বলতে গেলে এই রাত্রির উত্তাপটুকু ঝরে যাবে। এই উত্তাপ প্রয়োজন। এই উত্তাপই তাঁকে সাহস দেবে। দেখা যাক ঘটনার জল কোথায় গড়ায়।

পরদিন সকালে রণিতা বলল, বদলি হয়ে আসা যাবে না?

বুঝতে পারছি না কিছুই।

মেয়ে স্কুলে চলে গেছে। রাতে বলেছিল পাঠাবে না, কিন্তু সকালে পাঠিয়েই দিল রণিতা। গোলক বুঝতে পারছিলেন রণিতা তাঁর কথা শুনতে চায়। সকালের এই সময়টুকু নাগাদ তার বাপের বাড়িতে। কাছেই। মেয়েকে নিয়ে সে ফেরে। রণিতা বলল, তুমি খালি হাতে চলে এলে, তার মানে আসবে বলে বের হওনি, শেভ করোনি, আসার ঠিক ছিল না।

গোলক চুপ করে থাকে। রণিতা তাকে দেখছিল খুঁটিয়ে। চায়ের কাপ সামনের টিপয়ে। দুজনে মুখোমুখি। রণিতা জিজ্ঞেস করল, তুমি কেন চলে এলে?

ভালো লাগছিল না।

তা কি হয়, অন্য কারণ আছে।

তখনই ফোন এল র্বমণের, স্যার, কথা বলা যাবে?

ফোন কানে গোলক ঘরে গেল, র্বমণ বলল, গতকাল থানায় খুব ঝামেলা হয়েছে সন্ধেয়, না রাঙামাটির লোক না, পরিকল্পিত, তারা ওসির ঘরে ঢুকে টেবিল চেয়ার ভেঙেছে, বলছিল পেলে পিটিয়ে মেরে দেবে, মারতেই এসেছিল, আর মেরে দিলে জনতার রোষ হয়ে যেত তার কারণ, গতকাল মাঝরাতে ভরত কুইলার বডি সদরে দ্বারকেশ্বরের শ্মশানে দাহ হয়েছে পুলিশের তত্ত্বায়বধানে, স্যার আপনি ফিরবেন না, ছড়িয়ে যাচ্ছে ঘটনা, ডিয়েসপি না, আপনার ঘাড়ে পড়েছে সব, আপনাকে আমি জানাব সব।

রণিতা এসে দাঁড়িয়েছে ঘরে, তীব্র দৃষ্টিতে বিদ্ধ করল স্বামীকে, চাপা গলায় বলল, কী হয়েছে বলো, বলছ না কেন, তুমি কি পালিয়ে এসেছ, না বলে চলে এসেছ, পালিয়ে এসেছ ন'পাহাড়ি থেকে ?

বলব। গোলক হতাশ হয়ে খাটে বসে পড়ে, আমার কাস্টোডিতে একটা লোককে মেরে ফেলেছে.........।

কী বলছ তুমি, একটা লোক মরে গেছে, মানে টরচারড টু ডেথ! তুমি তাই পালিয়ে এসেছ, মানুষ মেরে পালিয়েছ ?

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করতে করতে ভর্য়াত হয়ে উঠল রণিতার মুখ। ঘাড় হেট করে কথাগুলি বললেন গোলক, আমি নই রণিতা, ডি,এস,পি আর তার ড্রাইভার।

ডি,এস,পি, আর তার ড্রাইভার, তুমি বসে বসে দেখেছ, ড্রাইভারকে আটকাতে পারোনি, তুমি এই র্মাডারে সহায়তা করেছ ?

আটকাতে গিয়ে পারিনি।

ইস, কী ভয়ানক, আমাদের কী হবে!

বিলিভ মি রণিতা, ডি,এস,পি, ভরত কুইলাকে মারতেই এসেছিল, আমি বাধ্য হয়েছি লোকটাকে তুলে আনতে।

বাহ, বাহ, তোমার অদ্ভুত যুক্তি, তোমার সামনে লোকটাকে পিটিয়ে মারল, তুমি চুপ করে থাকলে, তুমি বাধ্য হয়েছ, তুমি কি মানুষ!

ইনসাবরডিনেশন হয়ে যেত কথা না শুনলে।

হিস হিস করে ওঠে রণিতা, ইনসাবরডিনেশন! মানুষের প্রাণ চলে গেল, তার চেয়েও সেইটা ইমপরট্যান্ট হলো, খাদানের ধসে চাপা পড়া মানুষের খোঁজ করছিল লোকটা, তুমি এর কথা আগে বলেছিলে গোলক।

বলেছিলাম, তাতে খাদান ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, লোকটা আমাকে বিশ্বাস করত, আমি তদন্ত শুরু করেছিলাম।

এখন তুমি কী করবে, মিডিয়া কি লুকিয়ে রাখবে এই ঘটনা ?

টিভি খোলো, দ্যাখো আরম্ভ হয়ে গেছে কি না, তুমি পালিয়ে এসেছ মানে অপরাধ মেনেই নিয়েছ, হা ভগবান, তোমার গায়ে খুনির তকমা লেগে যাবে।

সত্য তো তা নয়, পালিয়ে না এলে আমিও বাঁচতাম না, পাবলিক দিয়ে মেরে দিত......গলা বুঁজে গেল গোলকের।

রনিতা আচমকা টেলিভিশন খুলতেই, ঐ দ্যাখো, কী দেখাচ্ছে দেখ, না না, নিচে স্ক্রল করে যাওয়া নিউজ, ওইটা ক্রমশ বড় হবে, ছবি হবে, কথা হবে, যুক্তি তক্কো হবে, ঘেন্না হবে, তুমি এ কী করেছ গোলক, আমাদের সকলের সব্বোনাশ করে দিলে।

তেরো

পোস্ট মরটেম রির্পোটি এবং ব্লক হাসপাতালে করা ভিডিওগ্রাফির পর জেলার মানবাধিকার সংগঠন সক্রিয় হয়েছে। দুটো রিপোর্টে খুব মিল। থারটিফাইভ ইনজুরিজ ফাউন্ড ইন দ্য বডি, অতিরিক্ত প্রহারে মৃত্যু। নিউজ এজেনসি এই ঘটনা ফলাও করে ছেপে দিল জাতীয় সংবাদপত্রের পশ্চিমাঞ্চলের ক্রোড়পত্রে। পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু। ওসি গা ঢাকা দিয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ.........

বুবুন বলল, বাবা এসব কী লিখেছে ?

এস,পি, দেখবে।

বাবা মানবাধিকার সংগঠন কী স্টেটমেন্ট দিয়েছে দ্যাখো, তোমার ডিয়েসপি জানেন সব, তিনি থানায় ছিলেন সেই সন্ধ্যায়, রাঙামাটির লোকজন তাঁকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল অনেক রাতে, তারা সি,আই,ডি তদন্ত দাবী করেছে।

সন্দীপ বললেন, এসব বললেই হলো?

বাবা, পোস্ট মরটেম রির্পোটি বলছে, পিটিয়ে মারা হয়েছে।

পোস্ট মরটেম রির্পোটি ওরা পেল কী করে ? সন্দীপ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

সত্যি কি না সেইটা বলো।

ঘটনা থিতিয়ে আসছিল। এক পক্ষের উপর কেটে গেছে। পলাতক ওসির নামে একটি অনিচ্ছাকৃত হত্যার মামলা রুজু করা হয়েছে আগেই, তা শুনেছেন জেলা শাসক। তিনি বিষয়টি গা থেকে ঝেড়ে ফেলেছেন। না দিয়ে উপায় নেই, পরের ঘটনা এসে চাপা দিয়ে দেয় আগের ঘটনাকে। ঘটনার শেষ নেই। ভরত কুইলা চাপা পড়েই যাচ্ছিল, কিন্তু মাটি ফুঁড়ে উঠল দিন পনের-কুড়ি বাদে। জেলা শাসকের কাছে দরখাস্ত এসেছিল রাঙামাটি গ্রামের গণেশ কুইলার । পুত্রের মৃত্যুর সঠিক তদন্ত প্রর্থিনা করে সেই দরখাস্ত। সি।আই,ডি তদন্ত চেয়েছে সে। নিয়ম মাফিক সেই দরখাস্ত তিনি স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে ফরোয়ারড করেছিলেন। কিন্তু আজ মাথার ভিতরে একটা কাঁকর ঢুকে গেল বুঝি। কলকাতা থেকে একটা ডিটেইলড রির্পোট চেয়েছে। এস,পি দেবে। ডি,এম,ও দেবে। যেটা কেউ খেয়াল করেনি, পোস্ট মরটেম রির্পোট এবং ভিডিওগ্রাফির রিপোর্টের সঙ্গে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত রিপোরট মেলেনি একটুও। ইনকোয়েস্ট রিপোর্টের কথা ভুলে গেছে সকলে। কিন্তু স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে সেই রির্পোট যাবে। সব রির্পোট চেয়েছেন তিনি। আসলে যে ডাক্তার পোস্ট মরটেম করেছে, র্মগের সেই ডাক্তার মন্ডল কথা শোনেনি। তিনি খবর দিয়েছিলেন ডাক্তারকে। ডাক্তার এসেছিল। এস,পি, ডি,এস,পি, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ডি,এস,পি-র নাম উঠতে শুরু করেছে এর ভিতরেই। বাতাসে ছড়াচ্ছে খবর। গুপ্ত খবর সব বেরিয়ে যাচ্ছে। থানা থেকেই হয় তো। র্মগের ডাক্তার র্শীণকায়। সিড়িঙ্গে। শাদা জামা শাদা প্যান্ট, মাথার চুল কালো। ডাই করে মনে হয়। লোকটা খুব পান খায়। নাম পলাশ মন্ডল। বাড়ি র্বধমানে। চুপ করে বসে থাকল। তারপর বলল, আপনাদের ভয় নাই স্যার, সাচ্চা রির্পোট যাবে, বডি দেখে কি উল্টাপুল্টা লেখা যায় স্যার, পাপ হবে।

কী মনে হয়, র্হাট অ্যাটাক ? জেলা শাসক জিজ্ঞেস করেছিলেন।

বডি আজ ওপেন হবে, ইনজুরি আছে নাকি অনেক। ডাক্তার বলেছিল।

র্হাট অ্যাটাকই মনে হয়। এস,পি, বলেছিল।

প্রশাসন গতিশীল থাকে কী করে ? বড় র্কতার মতে মত দিলেই তা হয়। র্কতার ইচ্ছায় র্কম। র্কতার ইচ্ছাকে ধরতে পারলেই একজন র্কমচারী দক্ষ বলে পরিচিত হয়। উপরওয়ালার ভালোবাসা পায়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তা আন্দাজ করতে পেরেছিল। ডাক্তার পারেনি। এস,পি, এবং ডি,এম, র্হাট অ্যাটাক বলার র্অথ, তাকে সেই রির্পোটই দিতে হবে। লোকটা যেন বুঝতেই পারল না। ডি,এস,পি-র আভিজাত্যের কথা বলা হলো। বলা হলো মিঃ ভরদ্বাজের কথা। শুনতে শুনতে ডাক্তার বলল, নমস্য সবাই, আমি চাষা বাড়ির ছেলে, বাবাও হাল চাষ করতেন, আমি হয়েছি র্মগের ডাক্তার, ডোম, ইঁদুর, গলায় দড়ি, বিষ খাওয়া, আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া, রক্তমাখা দেহ, যা দেখব তাই লিখা হবে স্যার, উঠি স্যার।

পোস্ট মরটেম রির্পোট তাঁদের ইচ্ছা মতো তৈরি করাতে পারলেই সমস্যা মিটে যেত। সাসপেনশন তুলে ওসিকে বদলি করে দিত না হয় অন্য জেলায়। এখন ওসির বিরুদ্ধেই

মামলা শুরু করে দিয়েছে পুলিশ। ওসি বুদ্ধিমানের মতো গা ঢাকা দিয়েছে। পুলিস ওকে খুঁজে পেতে পারে, নাও পারে। ডি,এস,পি-র স্বার্থ যাতে রক্ষিত হবে, তাই করবে পুলিস। তাঁর দায়িত্ব পড়েছিল সেই রাত্রে। তিনি প্রশাসনিক প্রধান। তাঁকে পুলিশ দিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়। সুতরাং তিনি ডি,এস,পি-কে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এদিকে বাতাস অন্য কথা বলছে। বুবুন বলছে, বাবা, ওসির নামে মর্ডার কেস দিয়েছে পুলিস, আসল দোষী তো ছাড় পেয়ে গেল।

কেউ ছাড় পাবে না। তিনি বললেন।

তুমি কোনো রির্পোট দিতে পার না ?

জেলা শাসকের চিন্তা হচ্ছিল মেয়ে কলকাতায় ফিরে গেলে সমস্ত কথা না তার বন্ধুদের বলে দেয়। অবশ্য ফেসবুক, মোবাইল থাকতে কলকাতায় ফিরতে হবে কেন তাকে ? তিনি বললেন, আমার রির্পোট মানে পুলিস আর ডেপুটির রির্পোট, তাদের কথাই আমার কথা, আমি শুধু মন্তব্য করতে পারি, কিন্তু স্পটে ছিলাম না, কী মন্তব্য করব, থাক এসব কথা।

বুবুন বলল, আমি ন'পাহাড়ি যাব বাবা ?

কেন ?

জায়গাটা সুন্দর, বিহারীনাথ পাহাড় দেখব।

এখন থাক।

না যাব, তুমি আমাকে একটা গাড়ি দাও।

জেলা শাসক বললেন, না, এখন জায়গাটা গরম হয়ে আছে, সরকারি গাড়ি পাঠাব না, অ্যাটাক হতে পারে।

তা হলে গাড়ি ভাড়া করে দাও, সত্যি তো, আমি কেন সরকারি গাড়িতে যাব, আমি ট্যুরিস্ট হয়ে যাব বাবা।

আচ্ছা বিডিওকে বলে দিচ্ছি, তোকে সব দেখিয়ে দেবে।

না। ঘাড় বাঁকিয়ে অস্বীকার করল বুবুন এই প্রস্তাব, বাবা বিডিও আমাকে পাহারা দেবেন, আমি তা চাই না, আমি একা একা ঘুরব, ভয় নেই আমি থানায় যাব না বাবা।

এই কথা যখন এক পিতা পুত্রীর সঙ্গে হচ্ছে জেলায় তখন অনেক দূরে বাগুইয়াটিতে তাদের ফ্ল্যাটে কথা হচ্ছিল আর এক পিতা পুত্রীর ভিতরে। সকালের রোদ ব্যালকনি থেকে সরে গেছে। চৈত্রের আরম্ভেই গরম বেশ। পাখা চলছিল অনেকদিন পরে। স্তম্ভিত মুখে বসে আছে রণিতা। কাঁধে একটি ঝোলা ব্যাগ নিয়ে বসে আছেন গোলকবিহারী, বছর ছয়ের টিয়া তার পাশে। তার গলা জড়িয়ে ধরল, বাবা তুমি যাবে না।

তাই বললে হয়, যেতে হবে মা।

না তুমি যাবে না, সব দিন বললে নিকো পার্ক নিয়ে যাবে, গেলে না।

রণিতা বিরক্তির স্বরে বলল, আমি তো বলেছি নিয়ে যাব।

টিয়া বলল, না আমি বাবার সঙ্গে যাব, বাবা ঘরেই থাকল, আমাকে নিয়ে গেল না।
আহ টিয়া, তুমি থামবে, বাবা এখন যাবে।
টিয়া বলল, না যাবে না।
রণিতা বলল, তুমি ওঠ, কদিন এখন বাইরে থাকো, কথা বলবে যদি খুব দরকার পড়ে, বুথ থেকেই বলবে, কাল সন্ধেয় তোমাকে দেখিয়েছে টিভিতে, পুলিশি ইউনিফর্মে, মাথায় টুপি আর গোঁফ থাকায় কেউ সেভাবে খেয়াল করেনি, তুমি কী করে এসেছ তুমি বুঝতে পারছ না, সোমবার অফিসে গিয়ে আমি টের পাব, কী জানি কী হবে, পুলিস এল বলে, আমাকে তো বলতে হবে আমি জানি না।
চুপ করে আছেন গোলক। টিয়া তাঁকে আঁকড়ে রয়েছে। গতকাল সন্ধ্যার পর তাঁকে ফোন করেছিল র্বমণ, বলেছে, স্যার, আপনার ফোটো দেখিয়েছে টিভিতে, এবার আপনাকে ধরবে , ডিয়েসপি চলে গেছেন সিমলার ট্রেনিঙে, উনি নিশ্চিন্ত, জেলায় না ফিরতেও পারেন, স্যার আপনার খুব বিপদ।
মাইতি কী বলছে র্বমণ?
মাইতি আমাকে শাসাচ্ছে স্যার, মুখ খুললেই চাকরি খাওয়ার ব্যবস্থা করবে।
র্বমণ আমি তো কিছুই করিনি।
স্যার আপনি বাড়ি থাকবেন না, ধরা দেবেন না, ধরা দিলে কেসের ফয়সালা হয়ে যাবে, জেল থেকে বের হতে পারবেন না, জামিন দেবে না, আবার জেল হাজতেই মেরে দিতে পারে, সুইসাইড দেখাবে, ডিয়েসপির খুব বড় হাত, আপনি সরে গেলে সে নিশ্চিন্ত, আর বিচারেও আপনার শাস্তি হয়ে যাবে, র্মাডার কেস ফাইল হয়েছে আমি জানি।
আমি কোথায় পালাব র্বমণ ?
দূরে যাবেন স্যার, আপনি কোচবিহার চলে যান।
গোলক বলেছিলেন, আমি কখনো যাইনি কোচবিহার।
মানুষের ভালবাসা যে এমন হতে পারে তা ভাবতে পারেননি গোলক। পুলিস সার্ভিসে এসে তো শুধু তো ব্রজেশ র্শমা বা অমন মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভালোমানুষ অফিসারকে পেয়েছেন তিনি, বাকি সব মাইতি কিংবা তালুকদার সায়েব। র্বমণ তাকে বলেছিল, দুপুরে শিয়ালদা থেকে তিস্তা- র্তোষা এক্সপ্রেস ছাড়ে, ওতে উঠে পড়ুন স্যার, ভোরে নিউ কোচবিহার, তারপর আপনি বাসে দিনহাটা চলে যাবেন, আমার ভাইপো আপনাকে বাসস্ট্যান্ড থেকে নিয়ে যাবে স্যার।
তার কোনো বিপদ হবে না তো ?
সেফ থাকবেন স্যার, আপনি ভালোমানুষ, আপনাকে যদি বাঁচাতে পারি, আমি পুণ্য করব, মাইতি আপনার বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে ডির্পাটমেন্টে, আমি কিন্তু পাবলিককে সাবধানে বলে দিচ্ছি আসল ঘটনা কী, আপনি গা-ঢাকা দিয়ে থাকুন এখন।

রণিতা তীব্র স্বরে মেয়েকে ধমকায়, বাবা এখন যাবে টিয়া।

কেন যাবে ? টিয়া ফুঁসে ওঠে।

এই সরে আয় দেখি। ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়েকে টেনে নেয় রণিতা, মেয়ে কেঁদে ওঠে, তার মুখ চাপা দিয়ে রণিতা বলল, তুমি যাও, পুলিস এসে যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যায়, আমরা এখানে থাকতে পারব, দাদা জিজ্ঞেস করছিল তুমিই ওসি না আর কেউ ?

গোলকবিহারী দেখেছিল রণিতার চোখেমুখে যেন ভয় আর সন্দেহের প্রলেপ, কাল রাতে খুব কেঁদেছে, তখন বলছিল এক কথা, এখন বলছে অন্য কথা, আমি তোমার কথা সবটা বিশ্বাস করি না গোলক, অনেক কথাই চেপে যাচ্ছ , আসলে পালিয়ে এসেছ মানুষ মেরে, প্লিজ, তুমি যাও, ধরা দিয়ো না, ধরা দিলে কিছুই করতে পারব না।

আমাকে এই অসময়ে বিশ্বাস করছ না রণিতা, পাশে দাঁড়াবে না!

দাঁড়াব তো বটে, কিন্তু এখন তুমি তো ঘোষিত অপরাধীই, তুমি লাঠিটা কেড়ে নেওয়ার সাহস দেখাতে পারনি, অপরাধ না করেও অপরাধী, যাও কোথাও একটা, ধরা দিলে যাবজ্জীবন হয়ে যাবে, আমি উকিলের সঙ্গে কথা বলব জামিনের জন্য। গোলকবিহারী আর দাঁড়ায়নি। টিয়া হয়তো তার অতটুকু মাথাতেই আন্দাজ করতে পেরেছিল অবস্থা। বাবাকে রাখা যাবে না। সে হাত নেড়ে বলল, তুমি যাও ন'পাড়ি, আমি আর মা যাব ছুটি পড়লে, বাই বাবা।

গোলকবিহারী কাঁধে ঝোলা আর একটি হাত ব্যাগে জামা কাপড় গামছা, সাবান, পেস্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। রণিতা চায় না তার স্বামী ধরা পড়ুক। ধরা পড়লে বাঁচা কঠিন। বাড়ি থেকে পুলিস তুলে নিয়ে গেলে রণিতা আর থাকতে পারবে না এখানে। এই এতদিন তিনি ফ্ল্যাট থেকে বের হননি। দিনের বেলা ব্যালকনিতে যাননি। আত্মগোপনই করে ছিলেন। এতদিনের দাড়ি তার গালে। মাথায় একটা ক্রিকেটের টুপি। নিচে নেমে রিকশা ধরলেন গোলক, ভি,আই,পি, রোডে গিয়ে ট্যাক্সি ধরবেন, না কলকাতার বাসে নয়। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তিস্তা-তোর্ষা দুপুর দেড়টায়। মোবাইলে টাইম দেখলেন তিনি। হাতে অনেক সময়। তখন মোবাইল বাজল। রণিতা।

চোদ্দ

আরে যা যা রে বুলবুলি তুই মোর পিয়ার দ্যাশে........., ভগবানের গান আমার সঙ্গে চলেছিল যেন। ও উড়িয়া যাও রে----ওরে বুলবুলি ময়না...।

তিস্তা-তোর্ষা দুই নদী। দুই নদীর নামে এক ট্রেন। সেই ট্রেনে আমি চলেছি কোচবিহার। ভোরে পৌঁছব। চিনি না কিছুই। আমি উত্তরবঙ্গে তেমন আসিনি। সেই বছর সাত আগে দার্জিলিং, আর না। আমি পালিয়ে যাচ্ছি। স্টেশনেই খবর এল, পুলিশ বিভাগ সক্রিয় হয়ে উঠেছে আমাকে খুঁজে বের করার জন্য। আমি চলে আসার পর ফোন

এসেছিল রণিতার কাছে। বাগুইয়াটি থানা ফোন করে এসেছিল। আমি নেই শুনেও বিশ্বাস করেনি। ঘর দুটি, টয়লেট, কিচেন, পালঙ্কের নিচে...সব দেখেছে। কাগজপত্র নাড়াচাড়া করেছে। টিয়ার বইপত্রও দেখেছে যদি কোনো সূত্র পায়। রণিতা বলেছে সে কিছু জানে না, ন'পাহাড়ি থেকে ফিরিনি আমি। শিয়ালদা এসে থ্রি টায়ার স্লিপারে একটি জায়গা জোগাড় করেছি টিকেট চেকার লোকটিকে ভালো রকম দিয়ে। আমি স্লিপার পাব মালদা থেকে। সেই রাত সাড়ে দশ এগারোয়। বসে আছি চুপ করে। এর ভিতরে মেসেজ এসেছিল, র্বমণ বলেছে, দিনহাটা বাস স্ট্যান্ডে তার ভাইপো আসবে। সে-ই ব্যবস্থা করবে সব। এখন লুকিয়ে থাকতে হবে, তারপর দেখা যাবে কী হয়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নাকি সাসপেন্ড হবে স্যার, ডি,এম-এর মেয়ে এসেছিল, ফোনে বলব সব।

আমিঃ কে বলল ডেপুটির কথা ?

র্বমণঃ মাইতি, মাইতি বলছে অত ইনজুরি, উনি দুটো না তিনটে দেখিয়েছেন রিপোর্টে, মর্গের ডাক্তার আর ভিডিওয় পঁয়ত্রিশটা ক্ষত, কলকাতায় গেছে রির্পোট, সি,আই,ডি নামবে হয় তো।

আমিঃ মাইতিই তো তুলে এনেছে ভরতকে তার বাড়ি থেকে।

র্বমণঃ ওর কিছু হবে না স্যার, আপনি ওসি, আপনার ঘাড়ে সব পড়েছে, ডিয়েসপি বাবু সেদিন নাকি ঝিলিমিলি ছিলেন, পল্টন আর উনি বাদ হয়ে গেছেন এই কেস থেকে।

আমিঃ কে বলল ?

র্বমণঃ মাইতি, কিন্তু স্যার ডিয়েমের মেয়ে, জিনস আর পাঞ্জাবি পরে, সে এসে খোঁজ নিতে লাগল কী হয়েছিল।

আমিঃ সে কী করে ?

র্বমণঃ জানি না স্যার, আমাকে নিয়ে বিহারীনাথ পাহাড় গিয়েছিল, সেখেন থেকে শুখাজোড় হয়ে ফেরার পথে খাদান নিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল।

আমিঃ মাইতি কিছু জানে না তো এই বিষয়ে?

র্বমণঃ না, কিছুই বলিনি স্যার, ডিয়েমের মেয়ে সম্বিতা আমাকে আঙ্কেল বলে কথা বলছিল, খুব ভালো, সেই সন্ধে আর রাতের কথা সব শুনল, আমার মনে হলো সব বলি, বাইরের কেউ জানুক আসলে কী হয়েছিল।

এরপর মেসেজ বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। টাওয়ার থাকল না। বাইরে গনগনে রোদ। ট্রেনের কামরা গরম। কোনো রকমে একটি বসার জায়গা হয়েছে। হকার, যাত্রীদের কথাবার্তায় সরগরম ভিতরটা। আমি চোখ বুঁজে বসে ছিলাম। পালিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা ডেপুটিও কি পালাবে? ভুল হয়েছিল রির্পোট, সংশোধন করে নেবে হয়তো। তিনি তো চাপা দিতে চেয়েছিলেন ভরত কুইলার হত্যাকান্ড, ছাড় পেয়ে যাবেন।

আমি সেই গোলকবিহারি কুন্ডু। আমি হয়েছিলাম পুলিশের দারোগা। সাব ইনস্পেক্টার। বি,এ, পাশ করার পর একের পর এক কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসেছি। ইন্টারভিউ দিয়েছি কত। শেষে কি না পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাব ইনসপেকটারের চাকরি পেয়েছিলাম। স্বাস্থ্য, রেজাল্ট আর পরিশ্রমের ক্ষমতা আমাকে চাকরিটা দিয়েছিল। ছেলেবেলার গোলক আর বড়বেলার গোলক এক নয়। শীর্ণকায় গোলক যৌবনে পা দিয়ে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। আমাদের সেই গাঁয়ের স্কুলের নাম আমি উজ্জ্বল করেছিলাম। আমার সহপাঠীরা দু-একজন ব্যতীত কেউ এতটা অবধি এগোতে পারেনি। সহপাঠী সেই নিমাই করে জমি, মেয়ে আর গরুর দালালি। সীমান্ত অঞ্চল। এইসব কাজে পয়সা প্রচুর। সে দালালের দালাল, তাতেই ফুলে ফেঁপে গেছে। তবে মেয়েপাচারে ধরা পড়ে হাজত খেটেছে কয়েকবার। সদু-সদয় একটা মুদিখানা দোকান করেছে বাজারে। তার পরপর মেয়ে। বিয়ে দেবে কী করে সেই ভাবনাতেই রুগ্ন। পুঁজি-পাটা তেমন নেই, তার সেই চেহারা একেবারে দুমড়ে গেছে। আমি ঘুষ খাই না। মানুষ পেটাতেও পারি না। আমার এই স্বভাব পুলিশে অনেকের আছে, আবার অনেকের নেই। মৃদু গলায় কথা বলি। একটি প্রমোশনে আমি ইনসপেক্টার। আমার উপরওয়ালা এস,পি, ডি,এস,পি, আমার উপর অখুশি। আমি তাঁর কাছে মাস গেলে ভেট দিয়ে আসি না। কিন্তু এই কাজটি করে সুধন্য মাইতি। সে-ই টাকা তোলে, আমাকে বাদ দিয়ে, ভগবান বর্মণকে বাদ দিয়ে টাকা ভাগ করে। সদরে গিয়ে দিয়ে আসে বড় সায়েব, মেজ সায়েবকে। আমি তাকে নিবৃত্ত করতে পারি না। করার উপায় নেই। এই বিভাগে এইটা রীতি। আমি কোনো কিছুতেই কাউকে নিবৃত্ত করতে পারি না। নিজের মতো থাকতেই ভালোবাসি।

আমাদের গ্রামের বাড়ি ঠিক আর আমাদের নেই। দুই শরিকে বেচে দিয়েছে। কলকাতার বাসা বাড়িতে বাবা মা চলে গেলেন তিন বছরের তফাতে। দিদি থাকে আসানসোল। অবস্থা মনীন্দ্র সরকার। কাজ করত একটা জুটমিলে। বড়বাবু ছিল। মিল বন্ধ হতে ধরে পড়েছিল বাবাকে কলকাতায় এসে।

জেঠামশায়, আপনারা তো কলকাতায় থাকেন, দেশে আর যান না, বাড়িটা পড়ে আছে, থাকতে দেবেন ক'দিনের জন্য, আমি জমি কিনে বাড়ি করে উঠে যাব।

উঠবে তো?

ভগবানের নামে বলছি জেঠামশায় দুবছরের ভিতর উঠে যাব। বলে বাবার পায়ের সামনে গড় করেছিল লোকটা।

থাকতে দিয়েছিল বাবা। কিন্তু সে আর ওঠেনি। কয়েকবার বলা হয়েছিল, সে বলেছিল উঠে যাবেই, কিন্তু ফোকটের অমন পাকা দালান ছেড়ে সে যাবে কেন ? আমি তখন বেকার। গ্রামে ছুটে বাড়ি খালি করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। তারপর মনে হয়েছিল, ছেলেপুলে নিয়ে ও যাবে কোথায়? মা আর বাবা বলেছিল, কথা দিয়েছিল, কথা রাখেনি মনি, কেউ বসে গেলে তোলা কঠিন। সেই সময় নিমাই এসেছিল কলকাতার

ফ্ল্যাটে, সে লোকটাকে ভয় দেখিয়ে তুলে দিয়ে বিক্রি করে দিতে পারে, বাংলাদেশী খদ্দের আছে, ফিফটি ফিফটি।

না করেছিলাম, মনে হয়েছিল নিমাই এমন কিছু ঘটাতে পারে যাতে থানা-পুলিস হবে। কে ছুটবে বারবার? নিমাই বলেছিল, পুলিসকে দিয়ে থুয়েই হবে কাজ। আমি না করেছিলাম, কেন মনে হয়েছিল মনীন্দ্র সরকার থাকুক, ছেলেপুলে সমেত উচ্ছেদ করলে সে যাবে কোথায় ? মনীন্দ্র কলকাতায় এসেছিল পরে সব খবর পেয়ে, আমার হাত ধরে বলে গিয়েছিল, গোলকভাই তোমার মঙ্গল হবে।

কিন্তু বাড়িটা ছাড়ার ব্যবস্থা করুন।

করব করব, আমি চেষ্টা তো করছি। বলেছিল মনীন্দ্র। আসলে সে বুঝে গিয়েছিল নরম মনের গোলকভাই তাকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। তার সে এলেম নেই। পারলে নিমাই দাস পারত, কিন্তু সে তো খালি হাতে ফিরে গেছে। গোলকভাইয়ের ভালো একটা মন আছে।

আমি পুলিশে চাকরি পাওয়ার পর মনীন্দ্র কলকাতায় আমাদের ভাড়াটে ফ্ল্যাটে এসেছিল এক ঝুড়ি আম নিয়ে, তার মুখচোখের চেহারা বদল হয়ে গিয়েছিল, সম্ভ্রম ফুটে উঠেছিল কথায়, বলেছিল, এত ভালো একটা সংবাদ পেলাম, আসতে তো হবে, আপনারা আমার আত্মীয়, আপনজন।

আমি তাকে বলেছিলাম, অনেকদিন তো হলো, বাড়িটা ছেড়ে দিন এবার।

সেই আধবুড়ো লোকটা, পাঁচফুট লম্বা, মাথায় চুল নেই প্রায়, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, হাফ শার্ট আর ঢলঢলে প্যান্ট, চটি, যার চার মেয়ের পর এক ছেলে, আচমকা আমার পায়ে পড়ে গিয়েছিল। কঁকিয়ে উঠে বলেছিল, হুজুর, দারোগা সায়েব, জানি আপনি তুলে দিতে পারেন, কিন্তু আমি যাব কোথায়, আপনার বাবা থাকতে দিয়েছেন, তিনি ভগবান, আমার তখন উপায় ছিল না। স্যার, আপনার পা চেটে আমি ধুলো পস্কার করে দিতে পারি, আমার মাথায় বুট পরা পা রাখুন, কিন্তু নিরাশ্রয় করবেন না।

করিনি। আমি উর্দির মাহাত্ম্য বুঝতে পেরেছিলাম। ক্ষমতা যে উর্দিতে তা বুঝতে পেরেছিলাম। আগে লোকটা আমাকে নাম ধরেই ডাকত, গোলকভাই বলে। পুলিশি উর্দিই তার সম্ভাষণ বদলে দিয়েছিল। সে খবর পেয়েছিল নিমাইয়ের কাছ থেকে। নিমাই আর সদয় আমার খোঁজ রাখত। আমি পুলিশে চাকরি পেলে সদু চিঠি লিখেছিল, মোদের গরব মোদের আশা, গোলক ভাই আমাদের ভুলো না, আমরা জানিতাম তুমি এমন হইবে, ছোটবেলার আনন্দের দিনগুলিকে মনে রাখিও, দুঃখের কথা ভুলিয়া যাইও।

নিমাই লিখেছিল, গোলকভাই যদি বলেন একদিনে তুলে দেব মনি সরকারকে।

চিঠির জবাব দেওয়ার সময় হয়নি আমার। মনীন্দ্রকে সে ভয় দেখিয়েছিল আমার নাম করে, এবার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হবে, খদ্দের পেলেই বেচে দেবে দারোগা তার সম্পত্তি। র্বডার পেরিয়ে আসা বাংলাদেশের লোককে সে বাড়ি দেখিয়েছিল পর্যন্ত।

আমি মনীন্দ্রকে বলেছিলাম, থাকো, কিন্তু আস্তানা করে নাও, এভাবে চলে না।

সে বলেছিল হবে হুজুর, চেষ্টা করছি খুব।

আমি কিন্তু দুবছরের ভিতর বাড়ি ফেরত নেব।

আমি খুব চেষ্টা করছি স্যার। বলেছিল মনীন্দ্র হাত কচলে।

আমরা তখন বেলগাছিয়া থাকতাম। সেই বাড়ি প্রোমোটিঙে গেলে বাগুইয়াটিতে ফ্ল্যাট কিনে বিবাহ। আমি এখন চলেছি কোচবিহারের পথে। আসানসোলে দিদির বাড়ি কিংবা বসিরহাটের আমতলীতে দেশের বাড়ি পুলিসে আগে খোঁজ করবে। কোচবিহারে আত্মগোপন করে থাকার কথা কেউ ভাবতে পারবে না। ভগবান র্বমণ সত্যিকারের ভগবান। যার কেউ থাকে না, ভগবানের হাত তার মাথায় এইভাবে এসে পড়ে। সমস্তদিন ট্রেন চলল। আমি একা, আর সমস্ত যাত্রীরই সঙ্গে কেউ না কেউ আছে। আমি ভেবেই নিয়েছি কথা বললে কী থেকে কী বেরিয়ে আসে, দরকার নেই। খুব ভোরে নিউ কোচবিহার। বাস স্ট্যান্ডে গিয়েছি পায়ে হেঁটে জিজ্ঞেস করে করে। ভোরের শহরে অল্প শীত। আমি সমস্ত রাত ঘুমোইনি। ঘুম এসেছে আবার ভেঙে গেছে ভয়ে। মনে হয়েছে আমার সন্ধান হচ্ছে এই ট্রেনে। সিকিউরিটির রেল রক্ষী চেকিঙে এলে বুক ঢিপ ঢিপ করেছে। কাকে খুঁজছে, কী খুঁজছে ওরা? ভরত কুইলাকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল ন'তারিখে, আজ মার্চের উনত্রিশ তারিখ। কুড়ি দিন বাদে আমি সত্যিকারের পালাচ্ছি। এতদিন তো আমি ছুটিতে ছিলাম। মেইল করে ছুটির কথা জানিয়ে দিয়েওছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমি এক পলাতক অপরাধী। লুকিয়েই থাকতে হবে। যে কোনো থানার ওসি আমার ব্যাচমেট হতে পারে। আমাকে দেখেই চিনবে। থানায় থানায় লুকআউট নোটিস চলে গেছে নিশ্চিত। এইটি সাধারণ প্রসেস। এয়ার পোরট, রেল স্টেশন সর্বত্র চলে যায় এই নির্দেশ। আমি বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে দিনহাটাগামী বাসে উঠে বসেছি। জানালার পাশে বসে বাইরে তাকিয়ে আছি। বাস একটুবাদে ছাড়ল। মেসেজ এল। ভগবান র্বমণ লিখেছে, ভাইপো সন্ন্যাসী র্বমণ থাকবে, আপনার দায়িত্ব ওর, চিন্তা করবেন না।

পনের

সেই ঘটনার পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুবল রায় কলকাতা গিয়েছিলেন মিঃ ভরদ্বাজের সঙ্গে দেখা করতে। অতবড় একজন অফিসার তাঁর মতো সামান্য এক ডেপুটির সঙ্গে দেখা করবেন, এ তাঁর পরম সৌভাগ্য। কিন্তু সেই গেস্ট হাউসে গিয়ে শুনেছেন, তিনি আসেনইনি, এলেও সেখানে আসেন মিটিং করতে। থাকেন না। যে নাম্বার থেকে সেই

রাত্রে তাঁর কাছে ফোন এসেছিল, সেই নাম্বারে পরে যোগাযোগ করতে গিয়ে ব্য্যথ হয়েছেন সুবল। ওদিকে রিং হয়নি। ধরাই যায় না। ডেপুটি জানেন না তাঁর নাম্বার যদি ব্লক করে রাখেন তথাকথিত মিঃ ভরদ্বাজ তিনি যোগাযোগ করতেই পারবেন না। অন্য নাম্বার থেকে ফোন করার সাহস হয়নি তাঁর। মনে হয়েছিল তিনি যে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেননি, এ মন্দের ভালো। ভরদ্বাজ সায়েবের সান ইন ল এই ঘটনায় ক্রমশ জড়িয়ে যাচ্ছেন, তিনি তদন্ত করেছেন, তাঁর পক্ষে ভরদ্বাজ সায়েবের সঙ্গে দেখা করা ঠিক হতো না। ভরদ্বাজ সায়েব যা করার আড়ালে থেকে করবেন। এস, ডি,ও পোস্টিং ভালোই হবে নিশ্চয়। আর তিনি যদি চিফ সেক্রেটারি হয়ে আসেন, তার পোস্টিং রাইটার্স বিল্ডিঙে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কোনো মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি, কিংবা চিফ সেক্রটারির দপ্তরের অফিসার হওয়া তাঁর স্বপ্ন। রাইটার্স বিল্ডিং-ই তো নিয়ন্ত্রণ করে সমস্ত রাজ্যের প্রশাসন। হবে তা। এঁদের ইচ্ছাতে সব হয়। গাছের পাতা খসে, ফুল ফোটে, আকাশে মেঘ হয়, বৃষ্টি নামে, একজন অফিসারের জীবন বদল হয়ে যায়। সেও নিয়ন্ত্রণর্কতা হয়ে ওঠে। তার কথাতেও মেঘ ওঠে, বৃষ্টি নামে, মরা মানুষ বাঁচে।

ইতিমধ্যে সেই নয়ই মার্চের রাত প্রলম্বিত হয়েছে। জেলা শাসকের সঙ্গে দুবার দেখা হয়েছে দুটি মিটিঙে। রুটিন ডিপার্টমেন্টাল মিটিং। জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনা ব্যতীত আর কোনো কথাই হয়নি। সময় চেয়ে পায়নি সুবল রায়। এরপর এক দুপুরে তিনি যখন নিজের চেম্বারে বসে ফাইল দেখছেন, তাঁর কাছে এক সি,আই,ডি অফিসার এলেন। দিন কুড়ি হয়ে গেছে। মধ্যবয়স্ক ব্যাক্তিটির চেহারা খুব সাধারণ, অমন মানুষ নানা কারণে ডেপুটির কাছে আসেন প্রত্যহ। হয়তো বহু বছর আগে তার জমি অধিগ্রহণ করেছে সরকার, ক্ষতিপূরণ দেয়নি। তা কবে নাগাদ মিলতে পারে সেই খোঁজে। ডেপুটি সুবল রায় জিজ্ঞেস করলেন, বলুন কী বলবেন।

ব্যক্তিটি তাঁর লাল আই-র্কাড এগিয়ে দেন ডেপুটির দিকে, বলেন, গত পরশু একটি কেস সি,আই,ডি-র হাতে এসেছে, তার এনক্যোয়ারিতে এসেছি, কয়েকটা কথা ছিল।

বলুন।

আপনি স্যার ভরত কুইলার পোলিস কাস্টডি ডেথ কেসে ইনকোয়েস্ট করে ছিলেন ?

র্অডার ছিল। ডেপুটি নিজ পদ মর্যাদা ও ঘটনা নিয়ে সর্তক হয়ে গেছেন। কেস সি,আই,ডি-র কাছে গেছে রাইটার্স বিল্ডিঙের আদেশে। জেলা পুলিশের বিরুদ্ধেই অভিযোগ, জেলা পুলিস তদন্ত করবে কী ভাবে? একটি মানবাধিকার সংগঠন হাই কোর্টেও গেছে।

রাতে কেন তড়িঘড়ি তদন্ত করতে হলো এবং ইনজুরির সংখ্যায় এত র্পাথক্য কেন?

ডেপুটি সুবল রায় বললেন, আমি কিছু বলব না, যা বলবেন আমার ডি,এম।

ডি,এম-ই তো আপনার কাছে পাঠালেন।

ডেপুটি বলেছিলেন, ডি,এম-কে জিজ্ঞেস না করে কিছু বলব না।
সি,আই,ডি, অফিসার বলেছিলেন, আমি তাহলে কী রির্পোট দেব, আপনি উত্তর দিতে অস্বীকার করছেন ?
সুবল একটু নরম হয়ে বলেছিলেন, আমি ডি,এম,কে রির্পোট করব, আপনি সেখানে পেয়ে যাবেন।
আপনি কি দুটি ইনজুরিই দেখেছিলেন?
ডেপুটি বলেছিলেন, ডি,এম-কে জানাব।
সি,আই,ডি অফিসার বলেছিলেন, আপনি এই ঘটনায় জড়িয়ে যাচ্ছেন স্যার, আর তা অহেতুক, আপনি স্পটে ছিলেন না, কিন্তু এও সত্যি, চেষ্টা করেছেন মর্ডারকে লুকোতে, সাহায্য করছেন অপরাধী যেই হন তাঁকে বাঁচাতে, দিস ইজ হাইলি আনফেয়ার।
ডেপুটি বলেছিলেন, আমি ডিয়েমের র্অডারে গিয়েছিলাম, তাঁর কাছে সব জেনে নেবেন।
সি,আই,ডি, চলে যেতেই ডেপুটি ভয় পেয়েছিলেন। জেলা শাসককে ফোন করেছিলেন তাঁর বাংলো অফিসে , ধরেছিল বড়বাবু রমেশ কর, তিনি জেলা শাসকের কাছে যাবেন কি না তা জিজ্ঞেস করতে রমেশ কর বলেছিল, সন্ধের দিকে স্যার ফ্রি থাকতে পারেন, তখন ফোন করে দেখতে পারেন।
এখন কি স্যার নেই?
ব্যস্ত, সাহেব আপনার কথা আমি স্যারকে বলব, যদি টাইম দেন আমি জানিয়ে দেব।
বিষণ্ন ডেপুটি ঘাড় হেট করে বসেছিলেন। তখন তাঁর সহর্কমী আর এক ডেপুটি রতন সেন তাঁর চেম্বারে ঢুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন এসেছিল সি,আই,ডি?
ডেপুটি মাথা তুলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সি,আই,ডি এসেছিল কে বলল?
বাইরে খোঁজ করছিল তোমার, সেদিন কী ঘটেছিল বলবে, কালেক্টরেটে নানা কথা ভেসে বেড়াচ্ছে, তোমার সঙ্গে কি ডিয়েসপি তালুকদার সাহেবের কথা হয়েছিল কোনো, তুমি এমন রির্পোট দিলে কেন, সূর্যাস্তের পর ইনকোয়েস্ট করতে নেই, জানতে না ?
কলকাতা থেকে ফেরার পর, ফোনে ভরদ্বাজ সায়েবকে না পেয়ে, ডেপুটির ঘুম গিয়েছিল। আন্দাজ করছিলেন কিছু একটা। কিন্তু কাউকে বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। সেদিন রাতে ডেপুটি সরকারি আদেশ পালন করতে যাচ্ছিলেন মাত্র। তিনি সৎ অফিসার। যেতে যেতে মনে হয়েছিল, খুব একটা ভুল রির্পোট দেবেন না, কিন্তু ভরদ্বাজ সাহেবের ফোন তাঁর ভিতরে ভূমিকম্প ঘটিয়ে দিয়েছিল। হিমালয় পর্বত যেন হেঁটে এসেছিল টিলা সদৃশ ভালকা পাহাড়ের কাছে। তাহলে তিনি করবেন কী ? ভরদ্বাজ সাহেব হিমালয়। ভরদ্বাজ সাহেব চিফ সেক্রেটারি হতে পারেন। তাঁর না বলা কথাই কথা। কী করতে হবে সেই ইঙ্গিত তিনি পেয়েছিলেন। আচ্ছা, সেই রাতের ফোনটা কি ডি,এস,পি-র ছিল, ভরদ্বাজের নয় ? ভেবে কুল-কিনারা পাচ্ছেন না ডেপুটি।

ওসি একটা মেইল করে গেছে। সেইটি মিথ্যে না সত্যি জানেন না তিনি। ডি,এস,পি, যে মেরেছে তা ছড়িয়ে গেছে গোটা জেলায়। ওসি গা ঢাকা দিয়েছে। সমস্তটা ওসিরই দায়। থানা হেফাজতেই মৃত্যু। কিন্তু দরখাস্ত জমা পড়েছে তালুকদারের বিরুদ্ধে। ভরত কুইলা প্রশাসনকে খুব বিব্রত করত। মরেও তা করছে। তবে দরখাস্ত পাঠালেই তো হবে না। প্রমাণ কই? তালুকদার ট্রেনিঙে দিল্লি গেছে। শ্বশুরই নিয়ে গেছে হয়তো। ফিরবে বলে মনে হয় না।

রতন সেন জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী করবে ভেবেছ ?

জানি না, ডিয়েমের কাছে যাই।

গিয়ে কী করবে ?

উনিই তো পাঠিয়েছিলেন।

র্অডার কই?

ফাইল র্অডার আছে। বলে সুবল রায় তাঁর হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটি ছোট্ট ফাইল খুলে সেই ফোটোকপি বের করেছিলেন। সেটি ভাল করে পড়ে রতন সেন বলেছিলেন, র্অডার ফাইলে, টাইপড হয়ে বের হয়নি, এত তাড়া! কই রাতেই ইনকোয়েস্ট করার কথা তো বলা নেই, আর্জেন্ট মেনশন করাও নেই।

সুবল বলেছিলেন, স্যার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন র্অডার সিন করে ন'পাহাড়ি যাওয়ার কথা বলতে।

রতন সেন বলেছেন, এটি খুব সাধারণ র্অডার, পরের দিন মর্গে গিয়েও করতে পারতে, রাতে ছুটে খুব ভুল করেছ, ইনকোয়েস্ট রির্পোট দেখাবে ?

সুবল রায়ের অহমিকা আছে। নিজে যে রির্পোট দিয়েছেন, তা কলিগকে দেখাবেন কেন? কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পারছিলেন, খাদের ধারে পৌঁছে গিয়েছেন। রির্পোট একদম ঠিক লেখেননি যে তা প্রমাণ হয়ে গেছে। তিনি সেই রির্পোটের কপি বের করেছিলেন ড্রয়ার থেকে। রতন সেনের হাতে তুলে দিয়ে টেবিলের উপর কপাল ঠেকিয়ে মাথা নিচু করে ছিলেন। খুব ভয় করছিল। রির্পোট লিখেছেন ভরদ্বাজ সাহেবের কথায় যেন বা। অথচ ভরদ্বাজ সাহেব কিছু বলেননি। শুধু ফোন করেছিলেন।

এতটা মিথ্যে কেউ লেখে! তুমি ডিয়েমের সারভেন্ট না কি পাবলিক সারভেন্ট? রির্পোট পড়তে পড়তে রতন সেন চাপা গলায় তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন, তুমি কি জানতে না ভিডিওগ্রাফি হয়, পোস্ট মর্টেম হয়, এই রির্পোট কেউ দেয়!

আমি চাপে ছিলাম। বলেছিলেন সুবল।

কে চাপ দিয়েছিল, চাপ নেবে কেন তুমি ?

সুবল চুপ করে আছেন। কে চাপ দিয়েছিল তিনি বলবেন কী করে? চাপ দিয়েছিল কি, না তিনি চাপ তৈরি করে নিয়েছিলেন। সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে উপরওয়ালার চাপ

নিজে ডেকে নিয়েছিলেন বুঝি। ভরদ্বাজ সাহেব ! কত উপরের মানুষ! ক্যাবিনেট সেক্রেটারি, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং করেন। পি,এম, তাঁকে নামে চেনেন, ফোন করে তাঁর চেম্বারে ডাকেন। কত বড় দেশ ভারত। বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা...পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা, দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ, তার প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাসভাজন, দেশের পলিসি মেকার তাঁর মতামতের মূল্য দেন, উচ্চতায় হিমালয়। তিনি ফোন করা মানেই কাজটা করে দিতে হবে, কী কাজ ? তা বুঝে নিতে হবে। সবটা কি বলে দিতে হবে? পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কাজটা করতে হবে। সামান্য এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কত ভার সহ্য করতে পারবে ? তিনি টের পাচ্ছিলেন চাপা পড়ে যাচ্ছেন। দম আটকে আসছে। নিজের জন্য এক সূঁচাগ্র পরিমান জায়গাও রাখেননি তিনি, যেখানে দাঁড়িয়ে শ্বাস নেবেন। রিপোর্টে জেলা শাসক চোখ বুলিয়ে বলেছিলেন জমা করে দিতে। তিনি কি আন্দাজ করতে পারেননি ওই রিপোর্টে কী হতে পারে, গরগর করে উঠলেন রতন সেন, ডিয়েম পড়ে দেখেছিল রিপোর্ট ?

ইয়েস। তিনি চশমার কাঁচ রুমালে মুছতে মুছতে বললেন, জমা করে নিলেন পড়ে।

ডিয়েম তোমাকে বলেছিলেন এই ভাবে রিপোর্ট করতে ?

না, সরাসরি কিছু বলেননি, বলেছিলেন এইটি ইমপরট্যান্ট ইনকোয়েস্ট।

তাহলে কে বলেছিলেন ?

কেউ না, মানে...। ডেপুটি ভাবছিলেন ভরদ্বাজ সায়েবের ফোনের কথা বলেন। কিন্তু চুপ করে থাকেন। কোথাকার জল কোথায় গড়ায় ঠিক নেই। তিনি বললেন, আসলে লো ভোল্টেজ, ইনসাফিসিয়েন্ট লাইট, চোখ সমস্যা করছিল, আমি বোধ হয় দেখতে পাইনি।

রতন সেন বললেন, তির বেরিয়ে গেছে, তুমি ফেঁসে গেছ, সি,আই,ডি-কে বলতে পারতে সব, ফিরিয়ে দিয়ে ভুল করেছ, তোমার প্রোমোশন সামনে।

ডেপুটির চোখের সামনে আচমকাই ভেসে উঠল ওসি, ন'পাহাড়ির মুখ। কী ভাবে লোকটা বসে ছিল টেবিলে মাথা রেখে। চারদিকে তখন গা ছমছমে নিস্তব্ধ রাত। বাইরে আধো অন্ধকারে ময়লা চাঁদের আলো। এস আই, মাইতি তিনবার ডেকে সাড়া পেয়েছিল, লোকটা মাথা তুলেছিল ধীরে ধীরে। যেন মাটি ভেদ করে উঠছিল তার মুখ-চোখ। ধসে চাপা পড়ে গিয়েছিল। তাঁকে ডাকছিল সহর্কমী রতন সেন, সুবল, ও সুবল, শুনছ, কী হলো ?

সুবল রায় মাথা তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করলেন, কী হতে পারে এরপর বলো দেখি রতন ?

ষোল

তিন দিন আমি থাকলাম ভগবানের পৈতৃক বাড়িতে। একান্নর্বতী পরিবারের একটি বাইরের দিকের একটি কুটুরিতে একা। ভগবানের ভাইপো সন্ন্যাসী ছোটোখাটো কনট্রাক্টর। রাস্তাঘাট

তৈরি করে। বকেয়া বিলের জন্য ঘুষ দেয়। আবার নতুন কাজের জন্যও ঘুষ দেয়। আমাকে এইসব কথা বলল প্রথম দিন। আমি সমস্তদিন চুপচাপ। খেয়ে শুধু ঘুমিয়েছি। পরের দিন উত্তরবঙ্গের সংবাদপত্র পেলাম। প্রায় সবই এদিকের খবর। নিশ্চিন্ত। ঘর থেকে বেরোতে বারণ করেছে সন্ন্যাসী। সারাদিন শুয়ে বসে। দ্বিতীয় দিন ভগবান তার ভাইপোর ফোনে ফোন করে আমার সঙ্গে কথা বলল, স্যার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের রির্পোট নাকি বাঁচিয়ে দেবে তালুকদার সাহেবকে, মাইতি গিয়েছিল রাঙামাটি, শাসিয়ে এসেছে, যদি একটা কথাও ওঠে খাদান আর ভরত নিয়ে, মেরে দেবে আবার, মাইতি বার বার জিজ্ঞেস করছে আপনি কোথায় থাকতে পারেন।

মনে হলো, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট লোকটাকে ফোন করি। মিথ্যে রির্পোট দিয়ে বহাল তবিয়তে চাকরি করছেন স্যার, আমার পক্ষে লিখতে বলেছিলাম, আমি কিছু করিনি সেইটা অন্তত লিখে দেবেন, এত উচুতে উঠেছেন কি মিথ্যে কথা লিখতে লিখতে? ! কিন্তু ক্ষোভ সংবরণ করলাম। ফোন ট্র্যাক করেই তো গা ঢাকা দেওয়া আসামীকে ধরা যায়। আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু দুদিন পরেই আমি ক্লান্ত। আর কতদিন যাবে জানি না। মনে হচ্ছে, খুপরির মতো এই একটা ঘর, ছোট একটি তক্তপোষ, বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার বেডসোর ধরে যাবে। জেলখানা এড়াতে আর এক জেলখানায় ঢুকে বসে আছি। তৃতীয়দিন সন্ধ্যায় সন্ন্যাসী ঘরে ঢুকে বলল, আপনার ছবি দেখাচ্ছে টিভিতে, কী হবে বুঝতে পারছি না।

আমি চুপ।

বাড়ির লোক ভয় পাচ্ছে, এই বাড়ি থেকে যদি ধরা পড়েন, আমার সব যাবে।

তাহলে কী করব ?

সন্ন্যাসী বলল, আমার দায়িত্ব স্যার, সকালেই মোটর সাইকেলে হরিশের তালুকে নিয়ে যাব, ওখানে পুলিস ঢুকতে পারে না, ছিটমহল, বাংলাদেশ।

রংপুরের তালুকদারের তালুক ?

ছিল স্যার, এখন ইন্ডিয়ার ভিতরে বাংলাদেশ, আসলে সেখানে বাংলাদেশ নেই, ভারতও নেই, স্বাধীন গ্রাম বলা যায়।

সেই আমি ভালো করে বুঝলাম এমন এক গ্রামের কথা যার আসলে কোনো দেশ নেই। "হরিশের তালুক", বাংলাদেশের গ্রাম, কাঁটাতারের এপারে, ভারতের ভিতরে, কিন্তু ভারতীয় পুলিস ঢোকে না। । ভগবান বলেছিল ডি এস পির পিতৃপুরুষ রংপুরের তালুকদার। গ্রাম আর জমি নিয়ে জুয়ো খেলত। জুয়ায় তারা এদিকের এক জমিদারের জমি জিতে নিয়েছিল। ওরে ও বুলবুলি আর ময়না। সেখানে চাষবাড়ি আছে ভগবান র্বমণদের জ্ঞাঁতির। দিনে যায়, সন্ধেয় ফেরে। মজুর কামিনরা থাকে। খামার বাড়ি আছে। কথা বলেছে সন্ন্যাসী, রাখবে বলেছে, থাকলে কোনো ভয় নেই। এঁদের সকলের রক্তই যেন ভগবানের রক্ত। আবার মনে হলো, ভগবান এই ভাবে হাত রাখেন মাথায়। পরদিন ভোরে সন্ন্যাসীর মোটর সাইকেলে আমি

ছিটমহল "হরিশের তালুক" যাত্রা করি। সীমান্তের দিকে ছুটে যাওয়া এই পথের নাম রংপুর রোড। অনেকটা গিয়ে রংপুর রোড থেকে ডাইনে ঘুরে নদীঘাট। জল থৈ থৈ নদীর নাম ধরলা, কাশেমের ঘাট। এপারে খেয়া ঘাটে মোটর সাইকেল জমা রেখে ধরলা পার হয়েছি খেয়ায়। হাওয়া উঠেছে, জলে ঢেউ খুব। নৌকো টাল খাচ্ছিল। ওই দূরে নদীর উপর একটি রেলব্রিজ। ভেঙে পড়ে আছে। দুদেশে ট্রেন চলাচল তো বন্ধ অনেকদিন। সন্ন্যাসী বলল, এই জায়গার নাম গীতালদহ। গীতালদহ ইন্ডিয়া, ওপারে মোগলহাট বাংলাদেশ। নদীর ওপারে গিয়ে বালির চড়া। চৈত্র শেষের সকাল তেতে উঠেছে এর ভিতরেই। বাতাসে বালি উড়ছে। আমি সন্ন্যাসীকে বললাম, এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে, বাংলাদেশ এসে যাবে যে।

সন্ন্যাসী বলল, ছিটের হাফ মাইল দূরে কাঁটাতার, ছিটে কেউ আপনাকে ডিস্টারব করবে না স্যার, ছিটের কোনো দেশ নেই।

বালির চড়া ভাঙতে ভাঙতে আমার মনে পড়ল মেয়ের মুখ। ঘুম ঘোরে বাবা বাবা করে সে। রণিতা কথা বলেছিল গত পরশু। অ্যাডভোকেটের সঙ্গে কথা বলছে সে। কেউ তেমন আশ্বাস দেয়নি। আত্মসর্মপণ করলে র্মাডার কেস চালু হয়ে যাবে। আমি কতদূরে! কী আমার ভবিতব্য জানা নেই। চোখে জল এসে গেল। ভগবান তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ! কোন অন্তহীনে? বালিতে পা ডুবে যাচ্ছে। বাতাস বালির ঝাপটা মারল। আমি দুমড়ে গিয়েও হাঁটছি। বালির চড়া পেরিয়ে হরিশের তালুক এসে গেল। সন্ন্যাসী বলল, এইটা স্যার বাংলাদেশ, কিন্তু ইন্ডিয়ার ভিতরে, রংপুরের তালুকদার জুয়ো খেলে কোচবিহারের রাজার অধীনস্ত জমিদারের কাছ থেকে এই গ্রাম জিতে নিয়েছিল, রংপুরের তালুকদারের জমি ছিল বলে পারটিশনের পর ভারতের ভিতর পাকিস্তান হয়ে ভারতের ভিতর বাংলাদেশ এটা, হরিশের তালুক।

আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি, তালুকদারের জমি ?

হ্যাঁ স্যার, আমরা ছিলাম তার অধীনের রায়ত, রংপুরে তালুকদার ঘরে খাজনা দিতে হতো শুনেছি, এদিকের জমিদারের সঙ্গে জুয়া খেলে জিতে নিয়েছিল।

আমি শিহরিত হলাম। ও উড়িয়া যাও রে----ওরে বুলবুলি ময়না......। অনিন্দ্য তালুকদারের পিতৃপুরুষের জুয়া খেলে জেতা জোত-জমিতে এসে পড়লাম! আমি দেখছিলাম মস্ত খামার বাড়ি, ধানের গোলা, শীতের সব্জি শেষ হয়ে ক্ষেতের শ্রীহীন অবস্থা। ধান ঝাড়ছিল যারা আমাদের দেখে দুটো চেয়ার এনে দিল। সন্ন্যাসী আমাকে বলল, যোগেনকাকাকে বলা আছে, আপনি এখানে থাকবেন, কাকা এখনই এসে পড়বে গীতালদ' থেকে।

তাইই হলো যোগেন বর্‌মণ এসে গেল মিনিট পনেরর মধ্যে। আশির কাছে বয়স। বেশ বুড়োই বলা যায়। এতখানি পথ হেঁটে হাঁপাচ্ছিল লোকটা। গাঙ পেরিয়ে হেঁটেই আসতে হয়, চর জমিতে সাইকেল চলে না। মাঝারি উচ্চতার গৌরবর্ণের মোঙ্গোলীয় মুখের ছায়া ধরা যোগেন র্বমণ এক ঘটি জল খেয়ে মিনিট কুড়ি ঝিমোল চেয়ারে বসে। তারপর জেগে উঠে

বলল, সব শুনেছি, থাকুন, আমি এমন একজন খুঁজছিলাম, এরপর আমি সপ্তাহে একদিন আসব, আপনি তালুকের ভার নিন।

হু, কাকা আর পারে না, ছেলেরা সব বাইরে, বড় চাকরি করে। সন্ন্যাসী বলল।

আমার ভবিষ্যৎ স্থির হয়ে গেছে জেলখানার অন্ধকার কুটুরি। বদলে এই ব্যপ্ত আকাশের নিচের মুক্ত গ্রাম। ভালই লাগল। থাকি কদিন। নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব। তারপর ভাগ্য কোথায় নিয়ে যায় দেখি। যোগেন র্বমণ বলল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকবে এখানে, নায়েবি করো, বারোশ বিঘে জমিন, ফসল কম না, চাষবাস, হিশেবপত্তর, মজুর কামিনদের হপ্তার পেমেন্ট, কাজে যেন না ফাঁকি মারে, সব তুমি দেখবে নায়েবের মতো।

আমি চুপ করে শুনছি। যোগেন তখন এক কামিনকে ডাকে, লতা, বাবু এখেনে থাকবে, তুই বাবুর ডিউটি করবি।

বছর কুড়ি বাইশের কৃষ্ণকায়া কামিন মেয়েটি আমার দিকে অবাক হয়ে তাকায়। যোগেন র্বমণ আবার বলল, বাবু তুমার দাসী এইটি, রান্না থেকে সব কাজ করবে ই মাগী।

একটু থেমে যোগেন র্বমণ বলল, কোনো অসুবিধে হবেনি, সাতপুরুষের জমিন, দেখভাল করার লোক খুঁজছিলাম, এখেনে পুলিশ ঢুকতে পারে না, ফরেন তো, তুমু এখন ফরেনিয়া হইসো বাবু।

আমি বুঝতে পারছিলাম খুনের আসামী নদী পার হয় এখেনে চালান হয়ে গেল। যোগেন র্বমণ যেন বইয়ে পড়া জোতদার, তালুকদার। বলছে, টিভিৎ তুমারে দিখাইসে শুনিসি, ইখানৎ নিরাপদ, মাস মাস হাজার টাকা দিব বেতন, ফিরি কোনো কাজ হয়নি।

একটু বাদে সন্ন্যাসী চলে গেল। মন খারাপ লাগছে। যোগেন র্বমণ থাকল দুপুর অবধি। তারপর তাকে নিয়ে নদীঘাটের দিকে চলল এক মুনিষ। আমি একা হয়ে গেলাম। দুপুরে ভাত ডাল, ঝিঙের তরকারি খাওয়া হয়েছে। সবই এই মহলের ফসল। খামারবাড়ির মাথায় টিন, দেওয়ালও টিনের। একটা তক্তপোষ আছে। পরিষ্কার বিছানা। যোগেন এখেনে দিবানিদ্রা দেন। এখন আর দরকার হবে না। সপ্তাহে রোববার রোববার করে আসবেন বলে গেলেন। আজ তো সবে মঙ্গলবার। মজুররা কাজ করুক, যোগেন চলে যেতে আমি খামার ঘরের বিছানায় টানটান হলাম। আহ! কী নিশ্চিন্ত যে লাগছিল। সন্ন্যাসীদের বাড়িতে তো চোরের মতো লুকিয়ে ছিলাম বলা যায়। এখানে স্বাধীন। আমি শুয়ে পড়তে লতা ঘরে ঢুকল, পাও টিপার লাগব বাবু?

মেয়েটি কালোর ভিতরে শ্রীময়ী। ছিপছিপে র্পূণ যুবতী। মুখখানি ভীরু। আমি চট করে উঠে বসেছি, না তো।

তুমু হুইয়া থাকো, মুই সেবা করি।

যোগেনবাবুকে সেবা করতে হয় ?

হুঁ, উ দেওনিয়া তো, মেয়েটি জংলা শাড়ি আঁচলের খুঁট পাকাতে পাকাতে বলল, দেওনিয়া বুড়ার দাসী মু, বুড়া কই গিসে তাই তুমার দাসী হইসি।

আমি পুলিসি অভ্যাসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার কাছ থেকে সব জানতে লাগলাম। বুড়ো যোগেন র্বমণ দুপুরে তাকে নিয়েই শোয়। কিন্তু সে এত বুড়ো হয়েছে যে বিছানায় টান হলেই ঘুমিয়ে পড়ে। লতা সিমেন্ট করা মেঝেয় বসে কথা বলছিল, আমি সব জেনে নিচ্ছিলাম। তারা ছিটমহলের অধিবাসী। তাদের নাগরিকতা বাংলাদেশের, কিন্তু সেই দেশ কাঁটাতারের ওপারে। কোনোদিন যায়নি। বরং ইন্ডিয়া দেখেছে ধরলা পার হয়ে দিনহাটা গিয়ে। বাবুর ছেলের বিয়ের সময় কাজ করতে গিয়েছিল। আমার ঘুম আসতে লাগল। আমি ওর কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি কখন তা জানি না। ঘুম ভাঙতে দেখি বেলা পড়ে গেছে। মজুররা মাঠ থেকে ফিরেছে সব খামার বাড়ির সমুখে। আমি বললাম, কাল শুনব সব। আজ সবাই চলে যাক। লতা বসে ছিল বাইরে, জিজ্ঞেস করল, চা করে দিব বাবু?

চা করল সে। চা খেয়ে আমি নদীর দিকে চললাম। কত নিশ্চিন্ত আর র্নিভয় লাগছিল সেই রাতের পর আজ প্রথম। ফোনে র্চাজ কমে গেছে। এখানে তো ইলেকট্রিসিটি নেই, লতা বলল, ব্যাটারি দিয়ে র্চাজ ভরে দেবে আগামীকাল। আমি চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। এত বড় আকাশ, নদী, শূন্যতার ভিতরে আমিই যেন একটি মাত্র মানুষ। লতা বসে আছে ঘাস জমিতে। অন্ধকার হয়ে এল। ব্যপ্ত আকাশ তারায় তারায় কী যে রূপ নিল, ন'পাহাড়িতে এমনি দেখা যেত। লতা কী একটা গুনগুন করছে... ও উড়িয়া যাওরে......। আমি লতার গুনগুন শুনছি। সে থামল আচমকাই। আমি তার বাপ মায়ের কথা জিজ্ঞেস করলাম। নেই কেউ। বাপ হয়তো বাংলাদেশে ঢুকে গেছে বি,এস,এফ-এর লাথিতে। আর মা ভেগেছে ইন্ডিয়ার ভিতরে কোথাও। সেও একদিন ইন্ডিয়া বা বাংলাদেশে ভেগে যাবে। বুড়ার সঙ্গে শুতে গা ঘিনঘিন করে। লতার রান্না শেষ। আমার খাওয়াও শেষ হলো। লতা আমার সেবা করতে পারে এখন। আমি বাবুর নায়েব। বাবুর বদলে আমিই বাবু, দেওনিয়া। সে যদি বাবুর সেবা না করে, বি,এস,এফ-এর হাতে চলে যেতে পারে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। হু, লোক দিয়ে তুলে নিয়ে যাবে বাবু। বি,এস,এফ আছে নদীর ওপারে। আমার পা টিপতে টিপতে কথাগুলি বলতে বলতে, তারপর গুনগুন করতে করতে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল লতা।

একদিন গেল। দুদিন গেল...আমি ঘুরে ঘুরে মজুর কামিনদের র্নিদেশ দিলাম। কী করতে হবে তা লতাই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। এর ভিতরে লতা আমার সঙ্গে শুয়েছে। শুতে হবেই। বাবু বলে গেছে। আমি টের পেলাম যোগেন র্বমণ আমাকে সবদিক দিয়ে বেঁধে ফেলার ব্যবস্থা করে রেখে গেছে। এত জমি। দেখবে কে? বুড়ো তো এরপর হাঁটা চলাই করতে পারবে না। বিছানায় শুয়ে পড়বে। আমি পলাতক আসামী। টের পাচ্ছিলাম, আমাকে এই হরিশের তালুক গ্রামেই চাষাবাদ করতে করতে, উৎপাদনের হিশেব রাখতে রাখতে, ফসল বেচার হিশেব রাখতে রাখতে বুড়ো হয়ে যেতে হবে। আমি কদিন বাড়িতে ফোন করিনি। তাগিদও বোধ করিনি। সারাদিন এই জোতের ভিতরে কাটিয়ে, বসে বসে, ঘুমিয়ে জেগে, ঘুমিয়ে আমি বুড়ো যোগেন র্বমণ হয়ে যাব। আমার মন বসে যাবে এখানে হয়তো। তারপর! বুড়ো তো মরবে।

আমি থাকব। আমাকে যক্ষ করে রেখেই মরবে হরিশের তালুকের বারোশ বিঘে ফোকোটের জমির মালিক যোগেন বর্মণ। যাবজ্জীবন হয়ে গেল আমার। আমার বউ, মেয়ের সঙ্গে ইহজীবনে আর দেখা হবে না,কলকাতা শহর, আমতলী গ্রামে আর ফেরা হবে না। এ যে অন্য দেশ। ভারতের ভিতরে বাংলাদেশ। সব মনে হতে লাগল গভীর রাতে ঘুম ভাঙার পর। লতা মেঝেয় গিয়ে শুয়েছে আমার পৌরুষ নিয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে। আগামীকাল রবিবার। যোগেন আসবে।

যোগেন এল না। এল সন্ন্যাসী। বলল, বুড়ো নারসিং হোমে, ছোট একটা হার্ট অ্যাটাকের মতো হয়েছিল, ভয় নেই, কেমন আছেন স্যার ?

কী যে হলো, আচমকা আমি সন্ন্যাসীর হাত ধরে ফেললাম, আমাকে দিনহাটায় নিয়ে চলো, আমি আমার ব্যবস্থা করে নেব, চলে যাব।

ধরা দেবেন ? সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করল। তারপর বলল, আপনি এখেনে থাকুন, কাকা বলেছে, পুলিস হন্যে হয়ে খুঁজছে আপনাকে।

না, আমি থাকব না, আমার ভয় করছে, বুড়ো এই বারোশ বিঘে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে সটকে পড়ল।

সন্ন্যাসী অবাক। লতাকে আমি আমার ব্যাগটা আনতে বললাম, সন্ন্যাসী তা দেখে বলল, আপনার কি অসুবিধে হচ্ছে এখেনে?

ব্যাগ হাতে লতা এসে দাঁড়িয়েছে, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, দেওনিয়া ফিরবু না ?

মাথা দোলাই। আমার মনে হচ্ছিল বুড়ো যোগেন আজই মরবে। লতাকে নিয়ে আমাকে থাকতে হবে এখানে। ব্যবস্থা পাকা। আমি হাঁটতে আরম্ভ করলাম নদীর দিকে। বিরক্ত সন্ন্যাসী না পেরে আমাকে অনুসরণ করল। যেতে যেতে পেছন থেকে বলল, ভুল করলেন স্যার, কাকা বলেছে, অ্যারেস্ট হয়ে গেলে আপনার লাইফ ডেঞ্জার, আপনাকে দিনহাটা বাস স্ট্যান্ডে নামিয়ে দেব, তারপর জানি না।

আমি চুপচাপ ফিরে আসছিলাম। সামনে ধুধু বালুচর, মাথায় ধূসর হয়ে আসা থমথমে আকাশ, রোদ তেতে উঠেছে। গরম বাতাস বইতে শুরু করেছে। বালিতে ঘূর্ণি। আমি বললাম যা হয় হবে, এখেনে যখের মতো পড়ে থাকব না ভাইপো।

ঘাড় না ঘুরিয়ে টের পেলাম লতা তাকিয়ে আছে এই পথে, নদীর দিকে। সে এখন কাকে সেবা করবে কত্তা না এলে? বাতাসে ভেসে এল গুনগুন, ও উড়িয়া যাও রে—বুলবুলি ময়না.........। ফিরে তাকে দেখতে পেলাম না।

সতের

সম্বিতাকে যত গোপন করতে চান তার জেলা শাসক বাবা ততোই যেন সবটা প্রকাশ হয়ে যায়। ডেপুটি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে, তিনি তাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। ডেপুটি

তিন দিন ধরে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইছে, তিনি সময় দিতে পারছেন না। দেখা করে কী হবে সুবল রায়ের? কী বলবেন তিনি। সি,আই,ডি, তাঁর কাছে এসেছিল। সি,আই,ডি, ইনস্পেকটারের মুখে তিনি শুনেছেন, ডেপুটি বলেছে, ডি,এম, সব জানেন, যা বলার ডি,এম,কে বলবে সে। শুনে বিরক্ত হয়েছেন তিনি। সি,আই,ডি বলে গেছে সুবলের বিরুদ্ধেই রির্পোট যাবে। ডি,এম, কী জানেন? ৩৫টি ক্ষত না তিনটি ক্ষত ? তাঁকে মিঃ ভরদ্বাজ কোনো ফোন করেননি। এস,পি,কে করেছিলেন নাকি। তিনি ভরদ্বাজের কথা তুলে ডেপুটিকে কোনো নির্দেশ দেননি। একটু আগে, বিকেলের দিকে তিনি যখন নিজের অফিস চেম্বারে, তখন বাংলোর এই উপরতলায় যে বেস লাইন, সেখানে ফোন এসেছিল একটা। এই নাম্বারটা প্রাইভেট। সুবল রায় কী করে পেল, তাঁকে কি তিনি দিয়েছিলেন সেই রাতে? হয় তো। হ্যাঁ, তাই হবে হয় তো। যদি খুব দরকার পড়ে, তখন ল্যান্ড লাইনে যেন যোগাযোগ করে। রাতে তাঁর ফোন সাইলেন্ট করা থাকে। সুবল রায়ের ফোন একটু আগে ধরেছে সম্বিতা-বুবুন। সে জিজ্ঞেস করল, বাবা ডেপুটি সায়েব তোমাকে পাচ্ছেন না, তিনবার বাংলো অফিসে এসে ফিরে গেছেন, তুমি কি তাঁকে এড়িয়ে যাচ্ছ?

সন্দীপ বিরক্ত হলেন, সে কি তোমার কাছে অভিযোগ করেছে?

না, আমাকে তিনি চেনেন না, বাট হি ওয়াজ ট্রায়িং টু কানেক্ট হিজ বস, বস ওয়াজ অলটাইম আন অ্যাভেলেবল, বাবা ডেপুটি খুব বিপদে পড়ে গেছে নাকি ?

সন্দীপ বললেন, জড়িয়ে গেছে এই কেসে, তুমি এইসব ব্যাপারে মাথা না ঘামালেই ভালো, কলকাতা যাবে না?

সম্বিতা-বুবুন মাথা নাড়তে থাকে।

বাবা মেয়েতে কথা বেড়ে যেতে লাগল। ব্যালকনির বাইরে অন্ধকার। ছোটবেলা থেকে বাবা মেয়েতেই কথা হয় বেশি। শাসনে আদরে, স্নেহে, মায়ায় বাবা মেয়ে খুব কাছাকাছি। মাথা দোলাতে দোলাতে সম্বিতা বলল, বাবা, তুমি সেই ওল্ড ডে'জ এ পড়ে আছ, কলকাতা গেলে কি আমি যোগাযোগ করতে পারব না, লোকটা খুব ভয় পেয়ে গেছে, সাসপেন্ড হয়ে যাবে ?

সন্দীপ বললেন, সি,আই,ডি, তদন্ত করছে, ও বলেছে ডি,এম, সব জানেন, অযোগ্য লোক, প্রোমোটি অফিসার তো, সাসপেন্ড হবে সি,আই,ডি, চারজশিট দিলে।

সম্বিতা বলল, বাবা ওঁকে তো তুমিই পাঠিয়েছিলে সেই রাতে, আমি সব জানি।

আমার কাজই তো কোনো ম্যাজিসট্রেট দিয়ে ইনকোয়েস্ট করানো, রুটিন ওয়ারক, অস্বাভাবিক মৃত্যু হলেই করতে হয়।

সম্বিতা বলল, অত রাতে যেতে হলো তাই ?

জেলা শাসক মেয়ের কথার সরাসরি জবাব দিলেন না, বললেন, ও কেন এমন একটা ফিকটিসাস রির্পোট দিয়েছে জিজ্ঞেস করেছ কি তুমি?

প্রেশারে পড়ে।

কার প্রেশার বলো দেখি।

মাননীয় জেলা শাসকের। সম্বিতা ধীরে ধীরে বলল, জেলা শাসক জেলার হেড, তাঁর কথা ভুল হলেও মানতে হবে।

লায়ার, আমি এমন কোনো নির্দেশ দিয়েছি, ও তাই বলেছে?

না, তুমি নীল রক্তের কথা শুনিয়েছিলে সেই রাত্রে, আই এ এস, আই পি এস, আই,আর,এস,ক্যাবিনেট সেক্রেটারি, চিফ সেক্রেটারি, শুনে উনি ভয়ই পেয়েছিলেন, ওঁর সামনে প্রোমোশন, মহকুমা শাসক হবেন উনি, তুমি বোঝো বাবা।

তার সঙ্গে এই কেসের কি সর্ম্পক?

খুন তো আসলে একটা নীল রক্তের মানুষ করে ওসির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দিল্লি চলে গেছে, পাছে সে জড়িয়ে যায়, তাই ডেপুটিকে দিয়ে ভুল রির্পোট, ওই নিয়েই বাঁচত নীল রক্ত, সব দিকেই সেফ থাকতে চেয়েছিল ডি এস পি।

তুমি এইসব কথা ডেপুটিকে বলেছ ?

আমি বলব কেন, তিনি বললেন।

বুবুন তোমাকে আমি বলছি এই কেস খুব সেনসিটিভ, সি,আই,ডি, এনক্যোয়ারি করছে, তুমি কেন এইসব কথা শুনলে?

উনি তোমাকে পাচ্ছেন না, তুমি তাঁকে অ্যাভয়েড করছ।

হি ইজ মায় সাবরডিনেট অফিসার, আমি জানি কী করতে হবে কখন।

বুবুন বলল, বাবা, উনি কি সাসপেন্ড হবেন ?

হতে পারে, এই রকম ফিকটিসাস রির্পোট কেউ লেখে, র্মাডার কেসে ডেপুটি সেই অ্যাবস্কন্ডিং ওসিকে সাহায্য করেছে, এই অভিযোগ উঠেছে, র্চাজশিটের পর অ্যারেস্ট হলেই সাসপেন্ড হবে ।

বাবা, উনি নীল রক্তের ভয়ে এটা লিখেছেন, এ কথা তো সবাই জানে।

উঁহু, সে এই কেসের ভিতরে নেই, খুনটা পুলিস কাস্টোডিতে থানার ভিতরে হয়েছে, পুরোটাই ওসির দায়িত্ব, বুবুন তুমি এই নিয়ে মাথা ঘামাও তা আমি চাই না।

বাবা, তুমি আমার বাবা, তুমি চাও আসল অপরাধী আড়ালে চলে যাক, তার জন্য দুজন নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি পাক, মিঃ তালুকদারকে বাঁচানোর জন্যই কি ডেপুটিকে সেই রাত্রে ন'পাহাড়ি পাঠানো হয়নি, যদি সে ফেঁসে যায়, সেই আন্দাজে ডেপুটিকে দিয়ে এই রির্পোট লেখানো, আমি কি ভুল বলেছি বাবা ?

আইন তো তাকে ছুঁতে পারবে না।

সে ব্যবস্থা জেলা প্রশাসন করেছে, বাবা ওসি আর ডেপুটি কি সত্যিই অপরাধী?

র্কোট বলবে।

ডেপুটি কি অ্যারেস্ট হবে সত্যি?

হতেই পারে, সি আই ডি তার বিরুদ্ধে রির্পোট দিচ্ছে, ৩৫টা ইনজুরিকে ৩ লেখে কী করে, এটাও অপরাধ।

সত্যিই অ্যারেস্ট হবে ?

হ্যাঁ।

উনি জানেন না।

খুব জানে, ও কি বুঝতে পারছে না কী করেছে। জেলা শাসক অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন যেন।

তুমি কেন ওঁকে রাতে পাঠিয়েছিলে, সূর্যাস্তের পর এই কাজ নিষিদ্ধ শুনলাম।

হুঁ, ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না আগের দিনে, ফলে কম আলোয়, বেলা চারটের পর ইনকোয়েস্ট নিষিদ্ধ ছিল, এটা ব্রিটিশ আমলের আইন, এখন অসুবিধে নেই, দিন রাত একই, র্মগে বা অন্যত্র প্রচুর আলোর ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু রাতে এই কাজ করা যায় না আইন অনুযায়ী, রুল তো বদলায়নি, বাবা তুমি কেন পাঠালে, র্অডারটা রুলের বিপক্ষে কি ছিল না ?

ও না যেতেই পারত, আমার র্অডারে রাতে যেতে বলা হয়নি, আর্জেন্ট মেনশন করা হয়নি। কোনোক্রমে বললেন সম্বিতার বাবা, জেলা শাসক। তিনি টের পাচ্ছিলেন ক্রমশ ধরা পড়ে যাচ্ছেন। মাথা নুয়ে গেল। বুবুন বলল, নিজেকে সেফ রেখে......বাবা তুমি আমাকে যে সব কথা বলতে ছোটবেলায়, নিজে সৎ হতে হয়, মানুষকে ভালবাসতে হয়, হেল্পলেস মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়, আমি তো জানি আমার বাবা তেমনি, হেল্পলেস মানুষের পাশে দাঁড়ায় আমার বাবা, একটা লোককে পিটিয়ে মেরে দিল যে, তাকে আমার বাবা আড়াল করবে! নিরপরাধ ব্যক্তি ফেঁসে যাবে, চাপ দিয়ে ভয় দেখিয়ে ভুল রির্পোট...

বুবুন প্লিজ, থামো। কোনো রকমে বললেন জেলা শাসক।

আমি যা শিখেছি ছোটবেলা থেকে সব ভুল, আমি যাদের কথা পড়েছি সব ভুল, রবি ঠাকুর, নজরুল, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, গান্ধী, সুভাষ, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী......সব ভুল বাবা, তুমি আমাকে ভুল শিক্ষা দিয়েছো, ভুল ভুল ভুল।

জেলা শাসক টের পাচ্ছিলেন তিনি চাপা পড়ে যাচ্ছেন। তাঁর দম আটকে আসছে। এত প্রতিরোধের মুখোমুখি তিনি হননি কখনো। তিনি বলতে চাইলেন, বুবুন তুই থাম। বলতে পারলেন না। মাথা নুঁইয়ে বসে থাকলেন। তখন ল্যান্ড লাইন বেজে উঠল তীব্র স্বরে। সম্বিতা গিয়ে ফোন ধরল। জেলা শাসক বুঝতে পারছিলেন, ফোনটা সেই সুবল রায়ের। সুবল তাঁর তেমন পরিচিত ম্যাজিস্ট্রেট নয়। সব জেলা শাসকের, উচ্চ পদস্থ আমলার পেটোয়া কিছু অফিসার থাকে। তারা উপরওয়ালার স্নেহধন্য হয়ে তাঁর সমস্ত কাজ করে দেয়। দরকারে ছোটখাটো আইন বিরুদ্ধ কাজও। কিন্তু তাদের কাউকে তিনি সেই রাতে

খোঁজ করেননি তদন্তের জন্য। তিনি জানতেন, এ এক ভীষণ ঝুঁকির কাজ। আর তাঁর অনুমান সত্য হয়ে গেছে। তালুকদার পিকচারে নেই, অথচ তাকে বাঁচানোর জন্যই না গভীর রাতে সুবল রায়কে নীল রক্তের মহিমা বুঝিয়ে ইনকোয়েস্ট করতে পাঠানো। অহেতুক হয়েছে। বরং বিপদে পড়ে গেল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই। ডেপুটি ঠিক রির্পোট দিলেও তালুকদারের কিছু হতো না। তার কাস্টোডিতে তো মরেনি। সে তো ওইদিন ঝিলিমিলি ট্যুর দেখিয়েছে। ন'পাহাড়ি যায়নি কোনোক্রমে। আর ওসি গা ঢাকা দিয়ে নিজে যেমন বেঁচেছে, তালুকদারকেও বাঁচিয়েছে। ডি, এস, পি, তালুকদারের কাস্টোডিতে মরেনি, থানা হাজতে মরেছে, তালুকদারের কিছু হবে না যে তা অনুমান করা উচিত ছিল তাঁর। সব দায় ওসির। অথচ ডেপুটি সুবল রায় যখন রির্পোট তাঁকে দেখালো, তিনি উদাসীন হয়ে তা জমা দিতে বললেন! কেন ? ভরদ্বাজ সাহেব চেয়েছেন এমন একটা রির্পোট দিক ম্যাজিস্ট্রেট সম্বিতা তাঁকে ডাকছে, বাবা তোমার ফোন, প্লিজ ধরো।
কে, কার ফোন ডেপুটির ?

ধরো না বাবা। সম্বিতা বলল র্কডলেস ফোনের মুখ চেপে, বুঝতে পারলাম না কে?

বলে দে উনি বিজি।

সম্বিতা বলল, তা হয় না, তুমি কি ভয় পাচ্ছ বাবা ফোন ধরতে?

তিনি হাত বাড়ালেন। ফোনটি নিলেন। কে বলছেন ?

ওপার থেকে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ ভেসে এল, স্যার, আমি ওসি ন'পাহাড়ি, লুকিয়ে আছি, আমি কিছু করিনি স্যার।

নম্বরটা কে দিল ?বিস্মিত জেলা শাসক স্বমহিমায় ফিরলেন, আপনি এখানে ফোন করছেন যে, খুব সাহস!

স্যার আপনি সকলের উপরে, আমি কোনো অন্যায় করিনি স্যার, আপনি বললে আমি ফিরে আসব, সারেন্ডার করব।

আমি কী বলব, আইন আইনের পথে চলবে, আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?
স্যার, মাধ্যমিক,এইচ,এস, বি,এ, এম,এ, টপার, সকলের উপরে তিনি, কিন্তু এত নিষ্টুর, দয়ামায়া নেই স্যার, আমি কিছু করিনি, সত্যিই না, ভরত কুইলাও কিছু করেনি স্যার, কী মার দিয়েছিল পল্টন, ডিয়েসপি সায়েব বসে দেখতে লাগলেন।

জেলা শাসক ফোন কেটে দিয়ে থমথমে হয়ে বসে ছিলেন। বুবুন, বুবুন কি দিয়েছে নম্বর ? বুবুনের সঙ্গে কি ওসির যোগাযোগ আছে, পলাতক আসামীর যোগ ? ভয় করল তাঁর। এই মেয়ের ভবিষ্যত কী ? ইস, মেয়েটা কী হয়ে গেছে তাঁর অজানতে?

আঠের

সেই দিনই গোলোকবিহারী দিনহাটা ত্যাগ করেছিলেন। ফিরছিলেন উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে। দিনহাটা বাস স্ট্যান্ডে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল সন্ন্যাসী র্বমণ। সেখানে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীর ফোন থেকে ভগবান র্বমণের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ভগবান বলেছিল, তাকে মাইতি ক'দিন ধরে জিজ্ঞেস করছিল বার বার কুন্ডু সায়েব কোথায় যেতে পারে, কোচবিহারে কি? তাই সে নিজেই তার ভাইপোকে বলেছিল, স্যারকে ছিটমহলে রেখে আসতে, পুলিশ ঢোকে না সেখানে, তাই।

গোলক বলেছেন, না, সেখানে থাকলে তিনি আর দেশে ফিরতে পারতেন না, আসলে তো ওটা বাংলাদেশ, আবার কোনো দেশই না, মন কেমন করছে টিয়া আর রণিতার জন্য।

ভগবান দুঃখ প্রকাশ করেছিল খুব, কী হবে স্যার আপনার, আমার চোখে জল এসে যাচ্ছে, আপনাকে হাতকড়া পরিয়ে ন'পাহাড়ি থানায় নিয়ে আসবে, ভাবলেই অস্থির হয়ে যাচ্ছি, স্যার একটা কথা বলব?

বলো, খবর দাও।

আমি আপনাকে একটা নম্বর দিচ্ছি, ডি,এম, সায়েবের নম্বর, ল্যান্ড লাইন, প্রাইভেট, আপনি তাঁকে বলবেন।

ডি,এম, উনি কি আমার কথা শুনবেন, বড় অফিসার, তাঁকে আমি কী বলব ভগবান ?

বলবেন, আপনি কিছু করেননি, নির্দোষ, বলবেন যা করেছে ডিয়েসপি।

উনি কি বিশ্বাস করবেন ?

ভগবান র্বমণ বলেছিল, সবাই সব জানে স্যার, আপনি বুথ থেকে ওনার ল্যান্ড লাইনে সন্ধের পর করবেন, উনি চা খেতে উপরে ওঠেন তখন।

এত খবর তোমায় কে দিল ভগবান ?

শুনতে হবে না স্যার, যার কেউ নেই, তবু তার কেউ থাকে, সে জানতেও পারে না তা, আপনি মালদা নেমে ফোন করবেন, পরপর ট্রেন আছে, পরের কোনো ট্রেনে ফিরবেন।

গোলক খবর পেয়েছিলেন অনেক। সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিপদে পড়েছে খুব। সাসপেন্ড হয়ে যাবে। একটা লোক র্মাডার করে দিল্লি চলে গেল, হয়তো ট্রেনিঙে বিলেত চলে যাবে, আর দু'জন লোক তার হয়ে জেল খাটবে। ডেপুটি অ্যারেস্ট হলো বলে।

মালদাতে নেমে পড়েছিলেন গোলক। একই ট্রেনে এতটা র্জানি করা নিরাপদ নয়, তাই নিশ্চিন্ত হয়ে ডি,এম-এর নম্বরে ফোন করেছিলেন বুথ থেকে। একটু ভয় করছিল। ডি,এম, বলে কথা। তিনি যদি মালদার ডি,এমকে ফোন করে......, যা হয় হোক। ফোন করে কথা বলে সাহস এসেছিল গোলকের। ডি,এম, ফোন কেটে দিলেন, কিন্তু কথাটা

তাঁকে বলা গেল। আগে একটি মেয়ে ধরেছিল। কী সুন্দর করে বলল, আমি দিচ্ছি বাবাকে, আপনি ধরুন, ধরে থাকুন, ছাড়বেন না আঙ্কেল।

সে কে ভগবান, মেয়েটা, যেন মায়ের মতো গলা।

ভগবান বলল, ডি,এম-এর মেয়ে সম্বিতা, ও জানত আপনি ফোন করতে পারেন।

কী করে জানত ?

ওই তো কথা বলতে বলেছিল স্যার।

অবাক গোলক জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি গা ঢাকা দিয়ে আছি, মার্ডারের চার্জ, জানে ও ?

জানে স্যার, সব তো শুনেছিল, আমি ওকে বলেছিলাম না, সে অনেক কথা।

ডি,এম ফোন রেখে দিলে গোলক ভগবানকে ফোন করেছিলেন বুথ থেকেই। ভগবানকে বললেন, আমি আর একটা ফোন করছি ভগবান, কী হয় তোমাকে বলব।

সাহস ফিরছিল, তিনি ডায়াল করেছিলেন ডি,এস,পি, তালুকদারের মোবাইল নম্বর। দুবারেও কানেক্ট করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিলেন। পরে মনে হয়েছিল, না করতে পেরেছেন বেঁচে গেছেন। বুথের নম্বর উঠে যেত মোবাইলে। লোকটা তখনই ফোনে ফোনে তল্লাসী আরম্ভ করে দিত মালদা স্টেশনে। তারপর তার সমস্ত রাতের যাত্রা শুরু হয়। শিয়ালদা নেমে স্টেশন সংলগ্ন হোটেলে উঠে বুথ থেকে রণিতাকে ফোন করেছিলেন, আমি ফিরে এসেছি।

কোথায়, বাড়িতে? রণিতা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

যাব, টিয়াকে দেখব একটু।

রণিতা বলেছিল, না গোলক না, পুলিসের নজর আছে, গেলেই ধরা পড়ে যাবে, আমি পথ খুঁজে পাচ্ছি না কী করে তোমাকে বের করে আনব, তুমি আবার ফিরে যাও।

তখন সমস্ত দুপুর ধরে ঘুমিয়েছেন তিনি হোটেলের ঘরে। রাত সাড়ে সাতটায় শিয়ালদা থেকে একটা হাসনাবাদ লোকাল ছাড়ে। তিনি ঠিকই করে নিয়েছিলেন, গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবেন। তাঁদের বাড়িতে সেই মনীন্দ্র সরকারের কাছে। লোকটা নিরীহ। অনেকগুলো মেয়ে আর একটা ছেলে নিয়ে সংসারে খুবই বিড়ম্বিত। তাকে বলবেন একটা ঘর ছেড়ে দিতে, তিনি থাকবেন তাঁদের বাড়িতে। না, মনীন্দ্রকে তিনি উচ্ছেদ করবেন না। বাবা বসিয়ে গেছে, তিনি কেন তাকে ভিটেছাড়া করবেন। কত অসহায় মানুষ, তাঁর চেয়ে বছর পনেরর বড়। কিন্তু তাঁকে দেখলেই ঢিপ করে প্রণাম। বলেছিল না জুতো পরিষ্কার করে দেবে জিভ দিয়ে। মানুষ আশ্রয়ের জন্য এতদূরও যেতে পারে। তিনিও আশ্রয় খুঁজছেন। ট্রেনে জানলার ধারে বসে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন গোলক। জীবন তাঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কী এর পরিণতি তা তাঁর জানা নেই। হু হু করে বাতাস আসছিল, সেই বাতাসে যেন ইছামতীর গন্ধ। গাড়ি বারাসত পেরিয়ে ঝমঝম করে ছুটছিল, হুইসিল

মারছিল। বারাসত পেরিয়ে কয়ড়া কদম্বগাছি, সন্ডালিয়া, বেলেঘাটা, ভাসিলা, হাড়োয়া, মালতীপুর, চাঁপাপুকুর......স্টেশনগুলো পরপর চলে যেতে লাগল অন্ধকারে। এইটি রাতের গাড়ি। ক্লান্ত প্যাসেঞ্জারদের নিয়ে ছুটে চলেছিল সকলের বাড়ির দিকে। গাড়ি খালি হতে হতে যেতে লাগল।

# #

কতদিন এই গাড়িতে যাইনি। আমাদের গ্রামেই বা কতদিন যাইনি। ভ্যাবলার পরে বসিরহাট স্টেশন। আমাদের গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে বসিরহাট স্টেশন। জায়গাটার নাম সাঁইপালা। সাইপালা নেমে বাঁদিকে বসিরহাট শহরে ঢুকতে হয়, সোজা রাস্তায় আমাদের গ্রাম। মস্ত এক আমগাছের ছায়া সেখানে অন্ধকারকে আরো অন্ধ করেছে। পাকা পিচ রাস্তা চলে গেছে হাসনাবাদের দিকে। সেই রাস্তা দিয়ে পরপর সাইকেল ছুটে গেল অন্ধকারে। যারা কলকাতা থেকে ফেরে, তাদের সাইকেল থাকে স্টেশনে সাইকেল স্ট্যান্ডে। আমি পিচ রাস্তা ধরে হাঁটছি। একা। একটা লোকও নেই আশেপাশে। শেষ বসন্তেও পাতলা সরের মতো ঠান্ডা, মাথায় মাফলার বেঁধে নিলাম। সুবিধেই হলো। মুখ অস্পষ্ট। আমার ব্যাগে একটা টর্চ। কিনেছিলাম দিনহাটায়। টর্চ জ্বালতে হচ্ছে না। অল্প চাঁদের আলোয় পথ বেশ পরিস্কার। পথ আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল গ্রামের দিকে। কত চেনা ছেলেবেলার এই পথ। পথ আমাকে চিনতে পেরেছে যেন। মনে হচ্ছিল পথ সমস্ত কথা জানে। আমি তো কিছু করিনি। তবু আমাকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। পথ যেন বলল, গেলি কেন সুবলা, গেলি কেন, এইতো সদয়, নিমাই, উদো, বড়মানকে, ছোটমানকে, বড়খোকা, ফুচেরা কত ভালো আছে, কষ্টসিষ্টে সংসার চালাচ্ছে বটে, ভালো আছে। তোদের বাড়ি যে নিয়েছে, সেই মনীন্দ্র তো তোফা আছে। শুধু তোর গুণগান করে। বলে, এতবড় অন্তঃকরণ হয় না, কুন্ডুবাবুর বাবা ভগবান ছিল, কুন্ডুবাবু ভগবানের অংশ...।

বলে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হ্যাঁ বলে, বলতে বলতে সাঁইপালা থেকে আমতলীর দিকে যায়, আমি তো সব শুনি।

আমি খুব বিপদে পড়ে গেছি যে।

জানি, টিভিতে দেখিয়েছে নাকি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে বলল টিভিতে দেখিয়েছে।

সবাই তো জানে, ট্রেনের প্যাসেঞ্জাররা বলতে বলতে যায় আমতলীর দিকে।

আমাকে চেনে ?

না, অনেকেই চেনে না, বলে ওরা আগে থাকত এখেনে, কলকাতা চলে গেছে অনেকদিন।

আমি আমতলায় পৌছলাম। নিঃঝুম। শেষ পান সিগারেটের দোকানটি বন্ধ হচ্ছিল। আমাকে দেখে ঝাঁপ না নামিয়ে দাঁড়াল। একটা বিস্কুটের প্যাকেট আর সিগারেট কিনলাম।

খিদে পাচ্ছিল। বিস্কুট আর জলে আপাতত রেহাই। দোকানদার আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছিল। মাথা মাফলারে মোড়া বলে দেখতে পাচ্ছিল না আমি কে, কিন্তু কৌতুহল ছিল চোখে। আমি হাঁটতে শুরু করলাম। শুনতে পেলাম লোকটা জিজ্ঞেস করছে, আমি কোথায় যাব। জবাব দিলাম না। হাঁটতে লাগলাম। হাসনাবাদের রাস্তায় চাঁদের আলো ছিল, গ্রামের ভিতরের রাস্তায় অন্ধকার। দুদিকে গাছগাছালি এত যে আকাশ দেখা যায় না। আমি জানি এই রাস্তা ঝাউতলায় গিয়ে দুভাগ হয়েছে। একটি ভাগ আমাদের বাড়ির দিকে চলে গেছে। অন্যটা সিধে হরিতলার পাশ দিয়ে বাজার। দুই রাস্তা আবার দুদিক দিয়ে হেঁটে বাজারেই গিয়ে মিলেছে। এই পথ আমাকে চেনে। মনে হতে লাগল পঁচিশ তিরিশ বছর আগের আমতলীতে আমি এসে গেছি। পথ আমাকে নিয়ে যেতে লাগল আমাদের বাড়ির দিকে।

আমি যাব কোথায়? আমাদের সেই পৈতৃক বাড়ির দিকে পথ আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। ডানদিকে ন্যাড়া ধানক্ষেত, ঘোলাটে জোছনা, বাঁদিকে বাঁশবন। খড়বন। তা পেরিয়ে পথ ঘুরেই দাঁড়াল, এই যে এসে গেলে! এই তো শ্রীহরি নিবাস, আমার ঠাকুরদার নামে বাড়ি।

আমি উঠনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পথ আমাকে রেখে নিঃঝুম গ্রামের ভিতরে চলে গেল, যাই আবার দেখা হবে। ওই দিকে কেশবস্যারের বাড়ি, আমি অঙ্ক কষতাম তাঁর কাছে, ঘটক বাড়ি তারপর। ভাবতে ভাবতে আমি ডাকলাম, মণিবাবু, ও মণিবাবু।

ঘুমিয়ে পড়েছে লোকটা। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। মোবাইলে সময় এখন পৌনে এগার। গ্রাম এত রাতে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে। টিভিও চলছে না। আমি আবার ডাকলাম, ও মণিবাবু, মণীন্দ্রবাবু।

কে? পুরোনো জানালার কপাট একটু খুলল।

আমি। উত্তরে নিজের নামটি বলতে পারলাম না।

আমি কে, নাম নেই ? খেঁকিয়ে উঠল মণীন্দ্র। তার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়েছি আমি।

বাইরে আসুন। আমি বললাম।

কেন, কে আপনি ?

আসুন না, দরকার আছে।

এরপর চুপচাপ। জানালার কপাট বন্ধ হয়ে গেল। আর সাড়া নেই। বোধহয় আবার শুয়ে পড়েছে। আমি পায়ে পায়ে বারান্দায় উঠে গেলাম, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে টোকা দিয়ে চাপা গলায় ডাকলাম, মণিবাবু, আমি গোলোকবিহারী।

আবার চুপচাপ। ভিতরে নারী পুরুষের আবছা আলাপ শোনা যাচ্ছে। তার মানে জেগে আছে। আমি দরজায় ঠক ঠক করলাম। আমাদেরই বাড়ি। পিতামহ শ্রীহরির নাম এখনো জ্বলজ্বল করছে বাড়ির মাথায়। অথচ দরজা খুলছে না। না, খুলছে খিল। লুঙ্গি আর গেঞ্জি গায়ে কালো মুশকো মণীন্দ্র বেরিয়ে এল। হাতে ছ'ব্যাটারির টর্চ, তুমি এয়েছ গোলক ?

হ্যাঁ, মণিবাবু।

আমার সারা গায়ে জোরাল টর্চের আলো ঘুরিয়ে লোকটা বলল, পালিয়ে বেড়াচ্ছ, একেই বলে ভগবানের মার, আমি তোর পায়ে পড়ে গিয়েছিলাম গোলক, বলেছিলাম জুতো চেটে দেব স্যার, বাড়িটা লিখে দিন, যা সাধ্য তাই দেব, তুই বললি বাড়ি ছেড়ে দিন, এখন চোরের মতো এখেনে এয়েচিস।

সম্ভাষণ বদল হয়ে গেছে। লোকটার পিছনে পরিবারের অন্য সদস্যরা, অন্ধকারের ভিতর কতগুলো জ্বলজ্বলে চোখ ভাসছে। আমি বললাম, ক'দিন থাকব এখেনে মণিবাবু।

একদম না, এক রাত্তিরও না, খুনেকে আশ্রয় দিয়ে শেষে আমি মরি, যা বেরিয়ে যা, টিভিতে দেখাচ্ছে তোকে দিনে একবার অন্তত, খুন করে পালিয়েচিস, গাঁয়ের নাম ডুবেচে। !

আমাদের বাড়ি আমি থাকব।

দূর, আমি থানায় খবর দিচ্ছি, থানার পুলিস কি এবাড়ি আসেনি ভেবেচিস, যা, খবদ্দার আসবি নে এদিকে।

মণিবাবু, আমি ক'টাদিন থেকে চলে যাব।

না, পা রাখতে দেব না আমি, যা চলে যা। গরগর করে ওঠে সেই আপাত নিরীহ মণীন্দ্র সরকার। সামনে রুখে এল, না গেলে আমি লোক ডাকব, ডাকাত ডাকাত বলে যদি চিৎকার করি, গাঁয়ের লোক এসে তোরে পিটিয়ে মেরে দেবে, চলে যা চুপ করে।

আর দাঁড়াইনি। ভয়ও পেয়েছি। পুলিস হেফাজতে পিটিয়ে মেরে গা ঢাকা দেওয়া গোলকবিহারী কুন্ডুকে ডাকাত বলে পিটিয়ে মেরে দিলে কোনো কেস হবে না। লোকে বলবে আপদ গেছে। ডি,এস,পি, তালুকদার নিশ্চিন্ত হবে। তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না আর কেউ। ঘোলাটে জোছনা রাতে আমি একা গাঁয়ের ভিতরে হাঁটছি। ঘুমিয়ে পড়েছে সব। আমি খুঁজে বের করেছি নিমাইদের সেই ভেঙে পড়া পুরোন দালান। চাপা গলায় ডাকছি। কুকুরের ঘুম ভেঙে গেছে। পাঁচটা কুকুর ভীষণ চিৎকার করতে আরম্ভ করেছে আমাকে ঘিরে। কে কে, বলতে বলতে একটা আধবুড়ো লোক বেরিয়ে এসেছে। টর্চের আলো পড়েছে আমার মুখে। আমি ডেকে উঠেছি, নিমাই, আমি গোলক।

গোলক, তুই খুন করেছিস, যাকে মেরেছিস, তার কথা ভেবেছিলি?

আমি না নিমাই, আমি না।

তুই না মানে, টিভিতে আজ সন্ধেয়ও দেখাল। নিমাই বলল, তুই যা গোলক, শালা মানুষ পিটিয়ে মারতে পারলি , তার মা-বাপের কথা ভুলে গেলি! চাপা গর্জন করে ওঠে নিমাই।

বুঝতে পারছিলাম রাষ্ট্রহীন ছিটমহলের গ্রামে থাকলেই পারতাম। কোনো রাষ্ট্রের ভিতরে আমি থাকতে পারব না। নিমাই আমাকে বলছে, চলে যা, ধরা পড়লে তোর ফাঁসি হবে, ব্ল্যাকে বর্ডার পার হয়ে বাংলাদেশ যা, আমি পার করে দেব।

আমি অন্ধকারে ফিরছিলাম। নিরালম্ব। কোথায় যাব ? ফোন করব ভগবান বর্মণকে ? নাকি অন্য কাউকে। মরেই তো যাব। সারাজীবন জেল খাটব। তখন আমি যা গতকাল

পারিনি মালদা স্টেশনে, আমার মোবাইলে থাকা ডি,এস,পি, তালুকদারের নম্বর ডায়াল করলাম, ফোন ধরেছে সেই নীল রক্তের মেধাবী পুরুষ, এত রাতেও ঘুমের জড়তা নেই। লোকটারও কি ঘুম গেছে! কী গম্ভীর কণ্ঠস্বর, হ্যালো, তালুকদার স্পিকিং।

'আমি ভরত কুইলা স্যার, রাঙামাটির ভরত, যাকে মেরেছিলে তুমি।

কে ? ওপারে কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। আর আমিও বুঝতে পারছিলাম না আমি কথা বলছি না অন্য কেউ ? না, আমিই, রাঙামাটির ভরত, বুট পরা পা আমায় চেপে মেরেছে।

যে ভরতকে পিটিয়ে মারলি তালুকদার, সেই ভরত।

কে, কে বলছেন? ভর্যাত কণ্ঠস্বর।

তোর নামে আঁচড়ও পড়ল না, ওসিটা পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কোনদিন হয়তো তাকেও মেরে দিয়ে পথ পরিষ্কার করে দিবি তুই, খাদানওয়ালাদের কথায় আমাকে পিটিয়ে মেরে দিব্যি হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছিস, আমি ভরত কুইলা, ছাড়ব না, উফ, মানুষ এভাবে মানুষকে মারতে পারে, বসে বসে দেখলি তালুকদার!

আমি সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফোন করতে করতে দেখলাম গরু পাচারের র্সদার নিমাই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। শুনছে আমার কথা। বললাম, কত লেখাপড়া জান তুমি তালুকদার স্যার, মাধ্যমিক, এইচ,এস-এ পজিশন, আমি সেকেন্ড ডিভিশন স্যার, ফেমিলিতে প্রথম ইস্কুল পাস, তুই আমারে থেতলে মারলি তালুকদার!

আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আপনি যার কথা বলছেন সে তো...। ওপারের কণ্ঠস্বর ভেঙে যাচ্ছিল ক্রমাগত। ভয় ধেয়ে যাচ্ছিল বাতাসে বাতাসে অন্ধকারে।

তোমাদের নীল রক্ত, কত ক্ষমতা, সবাই কত উঁচু উঁচু পদে আছে, দিনকে রাত করা কিছু না, কিন্তু আমি ছাড়ব না, আমি খাদান থেকে উঠে এসেছি,মর্গের টেবিল ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি তালুকদার, আমার মরণের হিশেব নেবই নেব।

ওপার থেকে ফোন কেটে দিল কেউ। নিমাই আমার হাত ধরেছে, কাকে ফোন মারলি তুই, কী বলছিস তুই কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি জবাব দিতে দিতে এবার ফোন করলাম জেলা শাসকের ল্যান্ড লাইনে। বুঝতে পারছিলাম নিস্তব্ধ বাংলোয় মধ্যরাতে বেজে উঠেছে তীব্র স্বর। ঘুম ভেঙে গেছে স্যারের। আমি ভরত কুইলা। আমার মা আমার বাবা ঘুমোয় না রাতে, খাদানে চাপাপড়া ছেলেগুলোর মা-বাপও ঘুমোতে পারে না রাতে। জেগে থাকে তারাদের দিকে চেয়ে। আজ আমিও কাউকে ঘুমোতে দেব না। ওদিকে ফোন তুলল কেউ, আমি বললাম, ভরত কুইলা স্যার, যাকে ডি,এস,পি-র ড্রাইভার পিটিয়ে, বুট দিয়ে থেতলে মারল, আমি কেন মরলাম স্যার, আপনি খুব জানেন, নীল রক্তের রোষে মরেছে ভরত, রংপুরের জুয়াড়ি তালুকদার শায়েস্তা করেছে অবাধ্য প্রজাকে, বিদ্রোহী প্রজাকে মেরে দিয়েছে, জেনেও তাকে আড়াল করেছেন কালেক্টর সায়েব, তুমি কি ব্রিটিশ কালেক্টর, স্বাধীন ভারতের কেউ না, আমি

ভরত কুইলা, খাদান থেকে সবাইকে নিয়ে উঠে এসেছি স্যার, মর্গের সব লাশ নিয়ে বেরিয়ে এসেছি স্যার......।

ওপারে কোনো কণ্ঠস্বর নেই। কথা শেষ হলে কেউ ফোনটা নামিয়ে রাখল ক্রেডেল থেকে নিচে। তার আগে আমার কথা শুনেছে সব। দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল যেন। কালেক্টর সায়েব শুনেছেন ঠিক। এত রাতে মানুষটা কি আমার ফোনের জন্য জেগে ছিল ?

নিমাই জিজ্ঞেস করল, আবার কাকে ফোন করলি তুই?

আমি বলছি যখন, ফোন এল আমার মোবাইলে। সুধন্য মাইতি, বললাম, ভালো আছ তুমি মাইতি স্যার?

কে? মাইতি জিজ্ঞেস করল।

আমি ভরত, ওই শয়তান তালুকদার ডিয়েসপি ফোন করেছিল তোমাকে ?

কোন ভরত?

কুইলা, রাঙামাটি ঘর, তুলে এনে মেরে দিলি তুই।

মাইতির গলা জড়িয়ে গেল, কী বলছেন?

ছাড়ব না মাইতি, আমি ছাড়ব না...সব বলে দেব সারারাত ধরে।

আপনি ওসি সায়েব বলছেন স্যার ?

না আমি ভরত কুইলা, খাদানের কয়লার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছি মাইতি।

কী করে হবে? মাইতি গুঙিয়ে ওঠে।

আমি ফোন কেটে দিলাম। আমি জানি মাইতি রাঙামাটি গিয়েছিল আবার। ভয় দেখিয়ে এসেছে, ফের যদি খাদান নিয়ে কথা বলে কেউ, ভরতের দশা হবে। তাদের কেউ কেউ গ্রামে থাকে না মাইতির ভয়ে, পালিয়েছে, আমি এবার তাদের ফোন করব। আমার বাবাকে, মাকে, ভাইকে। আমি কী করে ভরত কুইলা হয়ে গেলাম, আমি জানিনা। পুনরুত্থান হয়েছে আমার। গোলক আর ভরতের।

আবার মাইতি ফোন করেছে। বুঝতে পারছি ভয় এবার মাইতির ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। আমি ফোন কেটে দিয়ে হাঁটতে থাকি অন্ধকারে। মাইতি ফোন করেই যাচ্ছে। বেজে যাচ্ছে। আমি ধরছি না। ফোন কেটে দিলাম। আবার মাইতি। আবার। আবার। নিমাই আমার হাত ধরল, কী হয়েছেরে গোলক, আমার বিশ্বাসই হয়নি, তুই মানুষ মারতে পারিস।

দাঁড়া সেই বুড়ো বাবাকে ফোনটা করে নিই, নগেন কুইলা, আমার বাবা, লোকটা রাতভোর ছেলের মার কান্না থামায়, বাবা আমি ভরত।

তুই আমার বাড়ি চ, ভাত বসাতে বলি, ভাত খেয়ে ঘুমো, সকালে আমারেও সব বলবি ভরত, সব। নিমাই আমাকে টানল।

অন্ধকারে আবার ফোন বাজল। কে ? গান। ভগবানের গান...ও উড়িয়া যাও রে— ওরে বুলবুলি ময়না......। আমি কতদিন পরে শ্বাস নিতে পারছি। মুখ তুলছি খাদানের

কয়লার চাঙড়ের ভিতর থেকে। থানা হাজতে বুট পরা পল্টন ড্রাইভারের পায়ের নিচ থেকে, মর্গের অন্ধকার থেকে। আমি ভরত কুইলা। ওরে ও বুলবুলি আর ময়না, আমিই ভরত কুইলা। নিজের লাশ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম ভয়ে, এবার ফিরছি। ফিরছি কালেকটরের বাংলো, এস,পি-র বাংলো, ডি,এস,পি-র বাংলোর দিকে। ওরে ও বুলবুলি ময়না...থেতলে মরা ভরতের লাশ নিয়ে ভরত কুইলা এখন বড় বড় সায়েবের দরজায়।

# #

আপনি দেখুন মৃতের পুনরুত্থান কীভাবে ঘটে। আপনি আমার সঙ্গে ভরত কুইলার গ্রাম রাঙামাটি হয়ে শুখাজোড়ের চাপা দেওয়া খাদানের দিকে চলেছেন। পথে সেই ন'পাহাড়ি। সেই থানাগোড়া। ভীমাকার পাথরের স্তূপ। মরামানুষ পাথর হয়ে আছে, এমন মনে হতে পারে আপনার। ন'পাহাড়ি এমন।